প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

মদীয় অধ্যাপক

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজনীয়েষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থে বা পরবর্তী কালে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলীতে তাঁর সকল রচনা সংকলিত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অধিকাংশ রচনাই প্রথমে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করেন, পরে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থে প্রকাশকালে বঙ্কিম তাঁর সকল রচনা বা গৃহীত রচনার সকল অংশ গ্রহণ করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের উক্তিই আমরা উদ্ধার করতে পারি।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে (ভূমিকা) গ্রন্থকার লিখেছেন, 'বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও স্থানে স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।'

'বিবিধ সমালোচনে'র পর 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯ খ্রী), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭ খ্রী) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৯২ খ্রী) প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনো গ্রন্থেই আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সমালোচনাগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপ মুদ্রিত হয় না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের গ্রন্থাদির কিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, সে-বিষয়ে আমাদের অদ্যাবধি বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নি।

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থসমালোচনা করতে গিয়ে সাহিত্যতত্ত্বের কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। তবে গ্রন্থের সমালোচনাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সেই সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রকেই রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আমাদের অনবধানতায় আমরা সেই সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সমালোচনা অংশটাই এতকাল পরিত্যক্ত হয়েছিল; বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের পর তা কখনো সংকলিত হয় নি।

বঙ্কিম তাঁর অনেক রচনার অংশমাত্র পুনর্মুদ্রিত করেছেন, আবার তিনি তাঁর লেখা কোনো কোনো প্রবন্ধ আদৌ পুনর্মুদ্রিত করেন নি। বঙ্কিম নিজেই মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে 'বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগে'র বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন, 'যাহা এ পর্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম।' এবং 'অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।' এ-কথা বলার পর বঙ্কিম যে স্বল্পকাল জীবিত ছিলেন তার মধ্যে তাঁর নূতন কোনো গ্রন্থ বা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র কোনো সংস্করণও প্রকাশিত হয় নি। ফলে 'অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি'র পুনর্মুদ্রণেরও আর অবকাশ ঘটে নি।

উপরে উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট জানা যায়, বঙ্কিম তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর সকল রচনা সংকলন করে যান নি। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি' যে সংগৃহীত হওয়া অত্যাবশ্যক এ-কথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবেন না।

বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের মোট দশটি সমালোচনা-প্রবন্ধ সংগৃহীত। এর মধ্যে দুটি প্রবন্ধ (মিলপ্রদত্ত শিক্ষা ও মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়) এই প্রথম বঙ্কিম-রচনাবলীর অন্তর্গত হল। তিনটি প্রবন্ধ (বৃত্রসংহার, ঋতুবর্ণন ও পলাশির যুদ্ধ) বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থে নেই ; পরবর্তী কালে প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর মধ্যে 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায়ে সামান্য অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়েছে— এই প্রথম বৃহদাকার প্রবন্ধ তিনটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ পুনর্মুদ্রিত হল। অবশিষ্ট পাঁচটি প্রবন্ধের (অবকাশরঞ্জিনী, দানবদলন কাব্য, বহুবিবাহ, মানস বিকাশ এবং আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প) প্রত্যেকটিরই অংশমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে আছে, বর্তমান সংগ্রহে সম্পূর্ণ প্রবন্ধগুলি সংকলিত হল।

সংকলিত সব কয়টি রচনাই বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত। প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল প্রত্যেক রচনার শেষে প্রদত্ত হয়েছে। সংগৃহীত দশটি রচনাই সমালোচনা-প্রবন্ধ, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিম কর্তৃক লিখিত। যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে এই প্রবন্ধগুলি রচিত সেই গ্রন্থগুলির নাম রচয়িতার নাম-সহ প্রদত্ত হল : ১) অবকাশরঞ্জিনী— নবীনচন্দ্র সেন, ২) দানবদলন কাব্য— রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩) বহুবিবাহ রহিত

হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার : দ্বিতীয় পুস্তক— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৪) মানস বিকাশ— দীনেশচরণ বসু, ৫) আর্যশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি— শ্যামাচরণ শ্রীমানী, ৬) বৃত্রসংহার— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭) ঋতুবর্ণন— গঙ্গাচরণ সরকার, ৮) পলাশির যুদ্ধ— নবীনচন্দ্র সেন, ৯) জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত— যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০) তবকাৎ-ই-নাসিরী— আবু ওমর মিনহাজ্‌উদ্দীন।

দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচ্য গ্রন্থের নামটিই তাঁর সমালোচনার শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং সমালোচনাগুলির শিরোনাম থেকেও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে গ্রন্থের সমালোচনাই সমালোচকের মুখ্য উদ্দেশ্য ; অর্থাৎ 'আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার'ই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্যতম উদ্দেশ্য, 'সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার' মূল সমালোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয়মাত্র। অথচ বঙ্কিম তাঁর গ্রন্থে মূল সমালোচনার মধ্য থেকে 'সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার' অংশটুকু শুধু গ্রহণ করেছেন ; 'আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার' অংশ, অর্থাৎ যেটি সমালোচনা-প্রবন্ধের মুখ্য অংশ— তা-ই পরিত্যাগ করেছেন। ফলে যে প্রবন্ধের নাম ছিল 'অবকাশ-রঞ্জিনী' তা গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হল 'গীতিকাব্য' নামে। সেইরূপ 'দানবদলন কাব্য' সংক্ষিপ্ত হয়ে 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'মানস বিকাশ' সংক্ষেপিত হয়ে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ যা মূলে ছিল সাহিত্যের সমালোচনা, তা পরবর্তী কালে সংক্ষেপিত হয়ে নিতান্ত সাহিত্যতত্ত্বমূলক ক্ষুদ্রাকৃত প্রবন্ধে পর্যবসিত হল।

এখন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি আবিষ্কার করতে হয় তো বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনাই আমাদের উদ্ধার করতে হবে।

আমাদের সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত। এই পাঁচটির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে গ্রহণকালে বঙ্কিম শিরোনাম পরিবর্তন করেন। বাকি দুটি রচনার শিরোনাম বঙ্গদর্শনে যা ছিল, গ্রন্থেও তাই মুদ্রিত হয়েছে। সে দুটি প্রবন্ধ— 'বহুবিবাহ' এবং 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প'।

'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ১২৮০র (১৮৭৩ খ্রী) আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হলেও এই প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হয় দীর্ঘকাল পর— 'বিবিধ প্রবন্ধে'র

দ্বিতীয় ভাগে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। অথচ এ প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' (১৮৭৬ খ্রী), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯ খ্রী), বা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগের (১৮৮৭ খ্রী) অন্তর্গত হতে পারত। এ-কথা বলছি এই কারণে যে একই সময়ে রচিত 'অবকাশরঞ্জিনী' (গীতিকাব্য), 'দানবদলন কাব্য' (প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত) এবং 'মানস বিকাশ' (বিদ্যাপতি ও জয়দেব) প্রথমে 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছিল, পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখন প্রশ্ন 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণে এত বিলম্বের কারণ কি? এবং সম্পূর্ণ প্রবন্ধটাই বা কেন বঙ্কিম পুনর্মুদ্রিত করেন নি?

এই প্রশ্নের উত্তর লেখক নিজেই দিয়েছেন 'বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগে'র বিজ্ঞাপনে, এবং গ্রন্থমধ্যে প্রবন্ধের শিরোদেশে তৃতীয় বন্ধনীর অভ্যন্তরে। বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই।... এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত।... ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোনো না কোনো দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।'

প্রবন্ধের প্রথমাংশমাত্র পুনর্মুদ্রিত হয়েছে— এ-কথা বঙ্কিম স্পষ্টাক্ষরে জানালেও আজ পর্যন্ত অখণ্ড প্রবন্ধটি কোথাও পুনর্মুদ্রিত হল না, বঙ্কিম-রচনাবলীতেও সমগ্র প্রবন্ধটি উদ্ধার করা হয় নি। এ আমাদের ঔদাসীন্যের নিদর্শন ছাড়া আর কি? বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রয়োজনেই শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন— তবে প্রথমাংশ মাত্র; আবার সেই ইতিহাসের অনুরোধেই আমাদের দেখা প্রয়োজন অখণ্ড প্রবন্ধটিতে বঙ্কিম সেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন।

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রথমে দীর্ঘ ছিল, 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অংশ গৃহীত হয়।

'বৃত্রসংহার', 'ঋতুবর্ণন', 'পলাশির যুদ্ধ', 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা' এবং 'মুসলমান

কর্তৃক বাঙ্গালা জয়'— এই পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে শেষ দুটি প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের কেনো গ্রন্থে নেই এবং বঙ্কিমের কোনো 'রচনাবলী'তেও অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি।

এখন প্রশ্ন, প্রবন্ধ দুটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তার প্রমাণ কি?

প্রথমে 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা'র কথা। বঙ্কিম 'বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগে'র বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 'মনুষ্যত্ব কি? ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র।' 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধের দুই ভাগ। প্রথম ভাগের নাম 'মনুষ্যত্ব কি' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা'। বঙ্গদর্শনে 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা / মনুষ্যত্ব কি' প্রকাশিত হয় ১২৮৪র আশ্বিন সংখ্যায়, এবং 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা / মিলপ্রদত্ত শিক্ষা' মুদ্রিত হয় ১২৮৪র পৌষ সংখ্যায়। দুটি প্রবন্ধ যে একজনেরই রচনা তার প্রমাণ 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা'র প্রারম্ভেই আছে। এই প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমেরই রচনা তার আরও প্রমাণ পাই— যখন দেখি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) গোড়ায় অভিমত হিসাবে বঙ্গদর্শনের এই প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত এবং নীচে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম।

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তার প্রমাণ কি? প্রবন্ধের উপান্ত অনুচ্ছেদে আছে, 'ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজ্য রাজার, তিনি রক্ষা করিতে হয় করিবেন, না হয় পরে লইবে, প্রজার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা ভারতকলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি।'

'ভারতকলঙ্ক' যাঁর লেখা 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়'ও তাঁরই লেখা। 'ভারতকলঙ্ক' কার লেখা? উত্তর, বঙ্কিমচন্দ্রের।

'ভারতকলঙ্ক' প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এই প্রবন্ধ প্রথম পুনর্মুদ্রিত হয় বঙ্কিমের 'প্রবন্ধ পুস্তক' গ্রন্থে এবং পরে তা 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে সংকলিত হয়। 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রকাশের দশ বৎসর পূর্বে 'ভারতকলঙ্ক' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্কিম যখন 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধ লেখেন (১৮৮২ খ্রী), তার মাত্র তিন বৎসর পূর্বে 'ভারতকলঙ্ক' 'প্রবন্ধ

পুস্তক' গ্রন্থে (১৮৭৯ খ্রী) সংকলিত হয়। তাই 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটির কথা বঙ্কিমচন্দ্রের সহজেই মনে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রচারে মুদ্রিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। অর্থাৎ 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধ রচনার পরে। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন, 'ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোনো মূল নাই ; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র।' বঙ্গদর্শনে 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধে বঙ্কিম এ-কথাই বুঝিয়েছেন যে সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙলা জয়ের বিবরণ সত্য নয়।

'বৃত্রসংহার', 'ঋতুবর্ণন' ও 'পলাশির যুদ্ধ' প্রবন্ধ তিনটি বঙ্কিম তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলন করে যান নি। বঙ্কিম যে বলেছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি'— এ-গুলি সেই অসংকলিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ তিনটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ বঙ্কিম-রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় হল, কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য ব্যতিরেকেই রচনাবলী-সম্পাদক কর্তৃক মূল প্রবন্ধগুলির অতি সংক্ষিপ্ত অংশমাত্র মুদ্রিত করা হয়েছে। পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন সাহিত্য পরিষদের রচনাবলীতে যতটুকু মুদ্রিত হয়েছে তা মূল প্রবন্ধের কত সামান্য অংশ ; কোথাও এক-দশমাংশ, কোথাও তার চেয়েও কম। রচনাবলীতে একবারও উল্লেখ করা হয় নি যে মূল দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশবিশেষ মুদ্রিত হল। এমনভাবে সংবাদ গোপন করা হয়েছে যার ফলে অদ্যাবধি সাধারণ পাঠকে এই ধারণাই পোষণ করে এসেছেন যে ওই রচনাংশই মূল ও সম্পূর্ণ রচনা। বঙ্কিম নিজের গ্রন্থে নিজের রচনা যখন সংক্ষেপ করেছেন— তখন সে-কথা বিজ্ঞাপনে বলেছেন, পাঠকের সহায়ক হয়েছেন। আর আমরা তাঁর অংশ রচনাকে অখণ্ড রচনা বলে প্রচার করতে দ্বিধা করি নি। এর ফলে সাধারণ পাঠকমাত্রই নয়, বহু গবেষকও বিভ্রান্ত হয়েছেন।

'বৃত্রসংহার', 'ঋতুবর্ণন' ও 'পলাশির যুদ্ধে'র মধ্যে 'বৃত্রসংহার' দীর্ঘতম

সমালোচনা। 'বিবিধ' খণ্ডে 'বৃত্রসংহার' সমালোচনার সামান্য অংশ মাঝখান থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, সেটি যে অংশমাত্র তার কোনো নির্দেশ গ্রন্থে নেই। পরিবর্তে সম্পাদক মুদ্রিত রচনার নীচে লিখেছেন, 'বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, পৃ ৪৭২-৭৩।' এর অর্থ এই বুঝতে হয় যে ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে ৪৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় 'বৃত্রসংহার' শীর্ষক সমালোচনাটি মুদ্রিত হয়। বস্তুত তা নয়। মূল প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ; বঙ্গদর্শনের শুধু মাঘ সংখ্যায় নয়, মাঘ এবং পরবর্তী ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে ৪৭১-৪৮০ পৃষ্টায় এবং ৫০৪-৫১৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল।

সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশের পর একাধিক বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সর্বক্ষেত্রে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ক্ষুদ্র হরফে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে মাত্র। ফলে সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণে যে সকল ত্রুটি থেকেছে, পরবর্তী কালে প্রকাশিত রচনাবলীতে সেই ত্রুটিগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সাহিত্য পরিষদের রচনাবলীতে 'বৃত্রসংহার', 'ঋতুবর্ণন', 'পলাশির যুদ্ধ' সমালোচনার যতটুকু অংশ মুদ্রিত হয়েছে, পরবর্তী কালে প্রকাশিত রচনাবলীতে সেই ততটুকু অংশই মুদ্রিত হল— তার অতিরিক্ত একটি ছত্রও না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর 'বিবিধ' খণ্ডের প্রথম সংস্করণে 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায়ে 'মানস বিকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন থেকে উদ্ধৃত হয়। কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় নি। 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধটির প্রথমাংশমাত্র মুদ্রিত। এই 'মানস বিকাশে'র প্রথমাংশই যে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র মধ্যে মুদ্রিত হয়েছে— 'মানস বিকাশ' যে 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' নয়, 'বিবিধ' খণ্ডের সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস মহাশয় প্রথমে তা লক্ষ করেন নি। এই ত্রুটি 'বিবিধ খণ্ডে'র পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হয়— 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায় থেকে 'মানস বিকাশ' পরিত্যক্ত হয়।

এদিকে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের ভূমিকা সংবলিত যে বঙ্কিম-রচনাবলী সাহিত্য সংসদ প্রকাশ করলেন তাতে দেখা গেল 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধের ওই প্রথমাংশ আবার মুদ্রিত হল 'সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে

'অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায়ের মধ্যে। ফলে রচনাবলীর একটি খণ্ডের মধ্যেই একটি প্রবন্ধ দুইবার মুদ্রিত হল। একবার 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের মধ্যে, আর একবার 'পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায়ের মধ্যে। সাহিত্য সংসদের এই ভুলের কারণ— তাঁরা সম্ভবত সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণটিকেই প্রেসকপি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আরও লক্ষণীয়, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর একাধিক সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'মানস বিকাশ' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেবে'র যুগ্ম-প্রকাশ অব্যাহত।

আরও একটি কথা। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পূর্বে 'মানস বিকাশ' শীর্ষক সমালোচনা শেষের ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদটি মাত্র বাদ দিয়ে 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামেই। অর্থাৎ 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের মধ্যে মানস বিকাশ সম্পর্কিত সমালোচনা অংশও মুদ্রিত হয়েছিল। পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি কালে মানস বিকাশ বিষয়ক আলোচনা অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়।

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থে প্রথমে অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে উক্ত প্রবন্ধের প্রথমাংশ গৃহীত ও শেষাংশ বর্জিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। বঙ্কিম নিজেই 'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক'— 'এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'মানস বিকাশ' ও 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' সমালোচনা দুটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে একবার সংকলিত হয়েছিল— এ-তথ্য এতকাল আমাদের জানা ছিল না।

এখন প্রশ্ন, বৃত্রসংহার, ঋতুবর্ণন ও পলাশির যুদ্ধ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্র কৃত তার প্রমাণ কি?

এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবার কারণ কি? কারণ, বঙ্গদর্শনে আর পাঁচটি লেখার মত এই রচনাগুলিতেও লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। সমালোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার বা তৎকালীন লেখকবর্গের স্মৃতিকথা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় বৃত্রসংহার, ঋতুবর্ণন ও পলাশির যুদ্ধের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র

করেছিলেন। পলাশির যুদ্ধ ও বৃত্রসংহারের সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্র কৃত তা নবীনচন্দ্র সেনের আমার জীবন গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঋতুবর্ণনের সমালোচনা যে বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন তা গঙ্গাচরণের পুত্র অক্ষয়চন্দ্র রচিত পিতাপুত্র শীর্ষক স্মৃতিকথা থেকে জানা গেছে। এখানে স্মরণীয়, নবীনচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে গ্রন্থসমালোচনা দুটি স্বতন্ত্র রীতিতে লিখিত হয়। কোনো কোনো গ্রন্থের সমালোচনা বিস্তারিতভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত, আবার কোনো কোনো গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' শীর্ষক বিভাগের মধ্যে। এই বিভাগটি শুরু হয়, বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) কার্তিক সংখ্যা থেকে। সেই সংখ্যায় বিভাগটির নাম ছিল 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' পরে অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' নাম ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গদর্শনে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' শীর্ষক বিভাগটির সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোনো উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোনো কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই উদ্দেশে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি। গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণেই এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা বিরত ছিলাম। ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সাধ্যানুসারে সেই ইচ্ছামত কার্য হইতেছে।'

এই উদ্ধৃতির মধ্যে বঙ্কিম যে বলেছেন, 'ইচ্ছা আছে, অবকাশানুসারে গ্রন্থবিশেষের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব',— সেই ইচ্ছারই ফল— অবকাশরঞ্জিনী, দানবদলন কাব্য, বহুবিবাহ, মানস বিকাশ, সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি, বৃত্রসংহার, ঋতুবর্ণন, পলাশির যুদ্ধ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত গ্রন্থের সমালোচনা।

'অবকাশরঞ্জিনী'ই আধুনিক গ্রন্থবিশেষের বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত প্রথম বিস্তারিত সমালোচনা। নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরঞ্জিনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনা প্রকাশের পূর্বে 'শ্রীনঃ' স্বাক্ষরে নবীনচন্দ্রের একদিন শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শনে ১২৭৯র ফাল্গুন সংখ্যায়।

বঙ্কিম অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বলেছেন, 'এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদায় অপূর্বশক্তি-সহকারে উদ্ভূত করিতে পারেন।' এই অপূর্ব শক্তিটি কি সমালোচক তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। নাটক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের 'উত্তম উদাহরণ' হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির উত্তরচরিত, সেক্সপীয়রের ওথেলো, বাল্মীকির রামায়ণ এবং নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর উল্লেখ করেন।

সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এ-কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে অবকাশরঞ্জিনী কোনো অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয়, কোনো 'মোহিনী সৃষ্টির গুণ' এতে নেই, 'কোনো রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা'ও এই কাব্যে দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতাকে 'সুকবি' 'বিশুদ্ধরুচি' এবং 'যশস্বী হইবার যোগ্য' বলেছেন। নবীনচন্দ্রের কবিত্বশক্তির সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্র অনুধাবন করেছিলেন। এই কবির 'শব্দ প্রয়োগে পটুতা' সমালোচককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। নবীনচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, 'কাব্যোপযোগী সামগ্রীগুলি আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন তাহাই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট করেন।'

অবকাশরঞ্জিনী গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোথাও সমালোচক মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ করেন, আবার কোনো কোনো অংশ পাঠ করে তাঁর

'হেমবাবুকে স্মরণ হয়,, এবং উভয়ের আদর্শ বাইরনকেও মনে পড়ে।' অবকাশরঞ্জিনীতে যে মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের আদর্শ হিসাবে বাইরনের কথা বলেছেন; লক্ষণীয় বিষয় হল পরবর্তী কালেও বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বাইরনের সঙ্গে তুলনা করেন। 'তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি'— এ-কথা পলাশির যুদ্ধের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন।

অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, 'বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।'

নবীনচন্দ্রের কাব্যে কোথাও কোথাও মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের অনুসরণ থাকলেও সমালোচক সেজন্য কবির প্রতি কোনো অনুযোগ করেন নি। পূর্ববর্তীর কিছু প্রভাব পরবর্তীতে স্বাভাবিকভাবেই বর্তাবে। নবীনচন্দ্রের কবিতায় মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কিছু অনুসরণ থাকলেও তার জন্য সমালোচক কবিকে পরের নিকট ঋণী বলে 'অন্যায় নিন্দা' করেন নি।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত দানবদলন কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিম ১২৮০র বৈশাখে অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনা লিখে পরের মাসেই, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠে, দানবদলন কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেন। বঙ্কিম অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বাল্মীকি, ভবভূতি ও সেক্সপীয়রের উল্লেখ করেছিলেন; দানবদলন কাব্যের সমালোচনাতেও দেখি ভাগবত, কালিদাসের কুমারসম্ভব, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট এবং সেক্সপীয়রের রোমিও এণ্ড জুলিয়েতের উল্লেখ। উভয় প্রবন্ধেই দেখা যায় বঙ্কিম সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যের পটভূমিকায় দেশীয় সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যনিরূপণ করেছেন।

কাব্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান কি, এ-কথা সমালোচক প্রথমে সাধারণভাবে আলোচনা করেন ও পরে দানবদলন কাব্যটির বিচার করেন। অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য অপেক্ষা রচয়িতার কবিপ্রতিভার বেশি

প্রশংসা করেছিলেন, অপরদিকে দানবদলনের সমালোচনায় তিনি কবি অপেক্ষা কাব্যের অধিক প্রশংসা করেন। প্যারাডাইস লস্টে বঙ্কিম কবি অপেক্ষা কাব্যকে ছোট করেছেন। মিল্‌টন প্রথম শ্রেণীর কবি, কিন্তু তাঁর কাব্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য, 'প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্বিক পাঠ করে না। আনুপূর্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে।'

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বঙ্কিম স্পষ্ট বলেছেন, 'বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্বশক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।' আরও বলেছেন, 'তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দ রামচন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই।' কবির ব্যবহৃত ভাষাও সর্বাংশে উৎকৃষ্ট নয়।

কবিপ্রতিভায় নানা দুর্বলতা থাকলেও রামচন্দ্র প্রণীত দানবদলন কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বিস্মিত' করেছে। 'সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য'— এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার উপসংহারে বিবৃত করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকের (১৮৭৩ খ্রী) যে সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত কঠোরতম সমালোচনা বলে নির্দেশ করা যায়। কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এইরূপ কঠিন তীব্র সমালোচনা বঙ্কিম আর কখনো করেন নি। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সমগ্র বঙ্গদর্শনে এমন সমালোচনা আর কখনো প্রকাশিত হয় নি।

'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সমালোচনা করেছেন। এবং স্পষ্টতই এ সমালোচনা বিদ্যাসাগর বিরোধী সমালোচনা। সমালোচ্য গ্রন্থটি বিচার করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একবারও বিস্মৃত হতে পারেন নি যে এটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা। এই গ্রন্থ যদি বিদ্যাসাগরের পরিবর্তে অপর কোনও লেখকের রচনা হত, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যে এত কঠোর হত না তা নিশ্চয় করে বলা যায়।

এ-বিষয়ে এই নিশ্চয়তার কারণ কি ?

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই এই প্রশ্নের জবাব দেবে।— 'একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।'

'বহুবিবাহ' শীর্ষক সমালোচনাটি পাঠের পূর্বে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন— সেই ইতিহাসটা জানা দরকার। এ-কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আকস্মিকভাবে এই প্রবন্ধ লেখেন নি।

এই সমালোচনাটি প্রকাশের (১২৮০ আষাঢ়) পূর্বেই বঙ্গদর্শনে একাধিকবার বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ এসেছে।

বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১২৭৯র বৈশাখ থেকে ফাল্গুন সংখ্যায়। আষাঢ় সংখ্যায় সূর্যমুখীর কলম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন, 'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার একখানা বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?'

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথের কলমে ঔপন্যাসিকের মন্তব্য, 'যদি কেহ বলে যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন, যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ; তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে ?'

বঙ্গদর্শনে ১২৭৯র জ্যৈষ্ঠ; অর্থাৎ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তর চরিত' শীর্ষক সমালোচনা লিখতে শুরু করেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে অতি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না।'

আষাঢ় সংখ্যায় 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধের একস্থানে বঙ্কিম ভবভূতির রামের বিলাপ এবং করুণরসের বাড়াবাড়িকে নিন্দা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাসকে আক্রমণ করেন। উত্তর চরিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ইহার অনেকগুলি কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা

আর্যবীর্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোনো বাঙ্গালীবাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোনো মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।'

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থে বলেছেন, 'তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসকে বলিতেন কান্নার জোলাপ।'

১২৮০ বৈশাখে বঙ্গদর্শনে তুলনায় সমালোচনা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। লেখক যিনিই হোন, লেখাটি যে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদনের ফলেই প্রকাশিত হয়েছিল তা বলা অনাবশ্যক। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন লিখছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় টাঁকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দু আনি সিকি আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন।'

বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিমের এই বিদ্যাসাগর বিদ্বেষ তৎকালের অনেককে অসহিষ্ণু করেছিল। তৎকালীন হালিসহর পত্রিকা কবিতায় বঙ্কিম সম্পর্কে লেখেন—

আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস।

প্যারীমোহন কবিরত্ন বঙ্কিমের নামে ছড়া বেঁধে গাইলেন—

এ আস্পর্ধা কব কারে
গোস্পদ বলে না যারে
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হলো না তার?

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মধ্যে যে তীব্র বিরোধ ছিল তা তৎকালীন অঙ্কিত কার্টুন চিত্রের মধ্য থেকেও প্রমাণিত হয়। এ-প্রসঙ্গে বসন্তক পত্রিকার (প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা) অন্তর্গত The Bull and the Frog চিত্র দ্রষ্টব্য।

বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকেই যে বঙ্কিম বিদ্যাসাগর বিরোধী মনোভাব বহন করে এসেছিলেন তা দেখা গেল এবং তৎকালের অনেকেই যে এটা

লক্ষ করেছিলেন তাও জানা গেল। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে এ-কথা সহজেই বলা যায় যে, 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমের এই যে আক্রমণ তা আকস্মিক নয়; বরং দীর্ঘকালের কোনো চাপা বিরোধের সক্রোধ বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসাগর বিদ্বিষ্ট ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু বঙ্কিম যে একসময় বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষী ছিলেন তা জানতে পারছি। এখন প্রশ্ন হল, বিদ্বেষ থাক আর নাই থাক— মূল বিষয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য কি?

বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। দুই বৎসর পর বহুবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত হয়। উভয় গ্রন্থেই বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তকের বিজ্ঞাপনের সূচনাতেই বলেছেন, 'এ দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ও সমাজে বহুবিধ অনিষ্ট হইতেছে। রাজশাসন ব্যতিরেকে, সেই ক্লেশের ও সেই অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা নাই।' যাঁরা 'বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রানুমত ও ধর্মানুগত ব্যাপার' বলেন তাঁদের নিকটেই বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থ প্রচার। দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি কয়েকজন প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একমত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ।

এখন প্রশ্ন, বহুবিবাহ গ্রন্থের বঙ্কিম কৃত বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে (ক) বহুবিবাহ এদেশে স্বতই নিবারিত হয়ে এসেছে এবং স্বল্প কালের মধ্যে তার একেবারে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা, সুতরাং 'তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না।' (খ) বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করে তা নিবারণ করা যাবে না। (গ) এই প্রথা নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নেই— আর আইন যদি একান্ত আবশ্যক হয় তবে শাস্ত্রবিচারের আবশ্যকতা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন বহুবিবাহ স্বাভাবিকভাবেই দেশ থেকে একদিন লুপ্ত হবে। বিদ্যাসাগর চেয়েছেন বহুবিবাহের ন্যায় কুপ্রথা দেশ থেকে দ্রুত

বিলুপ্ত হোক। এর মধ্যে মতপার্থক্য নেই। লক্ষ্যে উভয়েই এক, লক্ষ্য স্থানে কে কখন পৌঁছবেন এই তফাৎ।

কেবল শাস্ত্রের বিচার করে যে বহুবিবাহ নিবারণ করা যেতে পারে না— এ-বিষয়ে বঙ্কিম যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বিদ্যাসাগরও এমন কথা কখনো বলেন নি যে কেবল শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে সমগ্র দেশ থেকে এমন একটা কুপ্রথা বিতাড়িত করা যায়। বিদ্যাসাগর পুনঃ পুনঃ বলেছেন এই কুপ্রথা রাজশাসন ব্যতিরেকে নিবারণ সম্ভব নয়। তবে তিনি যে শাস্ত্রের বিচার করেছেন— তা কেবল তাঁদেরই জন্য যাঁরা বহুবিবাহকে শাস্ত্রানুমোদিত বলে প্রচার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নেই; কিন্তু পরিশেষে এ-কথাও বলেছেন, 'যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।'— এ বিষয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যেখানে আইনের বিধান, সেখানে শাস্ত্রবিচারের প্রয়োজন নেই— কারণ শাস্ত্রবচনের পক্ষ-প্রতিপক্ষ চিরকাল থেকেই যায়।

বহুবিবাহ নিবারণ আইন যাতে প্রবর্তিত হয়, বিদ্যাসাগর সর্বদা তারই চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টারই ফল বহুবিবাহ পুস্তক। কেবল শাস্ত্রবিচারে এ-প্রথা দূর হবে না— এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর সবিশেষ সচেতন ছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তায় জোর দেন।

এতৎ সত্ত্বেও বঙ্কিম বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন— বহুবিবাহরূপ মুমূর্ষু রাক্ষসকে দুই এক ঘা লাঠি মেরে বিদ্যাসাগর নাকি 'ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত' হবেন।

সকল দিক বিবেচনা করে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাঁর যথার্থ সমালোচক সত্তার পরিচয় দিতে পারেন নি। বিষয়ের যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত আক্রমণেই যেন তিনি এখানে অধিক আগ্রহী এবং উৎসাহী।

বহুবিবাহ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত ভাষারও তীব্র নিন্দা করেছেন। বঙ্কিমের ভাষায়, বিদ্যাসাগরের প্রতিপক্ষেরা 'বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন।... বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্রলেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাঁহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।

এই বঙ্কিমই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লুপ্তরত্নোদ্ধার গ্রন্থের ভূমিকায় বলে গেছেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'

বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে আমাদের ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। ১৮৯২এ প্রকাশিত 'বিবিধ প্রবন্ধ— দ্বিতীয় ভাগে' বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট উচ্চারণ, 'দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি।' এ-প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। লুপ্তরত্নোদ্ধার বা 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথাগুলি বলেন, তখন বিদ্যাসাগর পরলোকগত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের তিরোধান ঘটে।

দীনেশচরণ বসু প্রণীত মানস বিকাশ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যসমালোচনা কালে বঙ্কিম দেশী বিদেশী অনেক কবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যেমন কালিদাস জয়দেব বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস পোপ জনসন প্রমুখ। মানস বিকাশ কাব্যের গোত্রনির্ণয় করতে গিয়েই বঙ্কিম বিভিন্ন কবির সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রথমে সমালোচক বঙ্গীয় গীতিকবিদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। একশ্রেণীর কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, আর একশ্রেণীর কাব্যে অন্তঃ-প্রকৃতির প্রাবল্য। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। বঙ্কিমের মতে কাব্যে বহিঃপ্রকৃতি প্রাধান্য ঘটলে ইন্দ্রিয়পরতা এবং অন্তঃপ্রকৃতি প্রাধান্য ঘটলে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মায়।

এই দুই শ্রেণী ব্যতীত বঙ্কিম আধুনিক গীতিকবিদের অপর আর একটি শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁরা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদলের অনুগামী। বঙ্কিমের মতে তাঁদের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী ও দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলে তাঁদের

কবিতাও বহুবিষয়িণী ও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হয়েছে, কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হয়েছে। উদারহরণ স্বরূপ বলেছেন বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিতার বিষয় সংকীর্ণ কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়, অপর দিকে মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নয়। বঙ্কিমের মতে শেষোক্ত শ্রেণীর কবিরা কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট।

মানস বিকাশ কাব্যের কবিকে বঙ্কিম আধুনিক ইংরেজি গীতিকাব্যের অনুগামীদের দলে স্থান দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, মধুসূদন হেমচন্দ্র বা দীনেশচরণ— সকলেই তো একই শ্রেণীভুক্ত, তবে পরস্পরের কবিত্বশক্তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

মধুসূদন সম্পর্কে সমালোচকের মত, মাইকেল কিছু পরিমাণে ইংরেজ কবিদলের শিষ্য আবার কিছু পরিমাণে জয়দেবাদির শিষ্য। কালিদাস জয়দেব প্রভৃতি কবির কাব্য ইন্দ্রিয়পর। তাই মধুসূদনের কবিতা ইংরেজি কাব্যের অনুসারী বা অনুকারী হয়েও তা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট নয়। হেমচন্দ্রও স্বীয় প্রতিভাগুণে তাঁর কাব্যকে অনেক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা দোষ থেকে দূরে রেখেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের মতে অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি এবং মানস বিকাশের কবির এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল।

মানস বিকাশ কাব্যের কোনো কোনো অংশকে বঙ্কিম 'এমন সুন্দর যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য' বলে মন্তব্য করেছেন। অবকাশরঞ্জিনী কাব্যের সমালোচনাকালে বঙ্কিমের মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে মনে পড়েছিল, মানস বিকাশের সমালোচনায় আবার হেমচন্দ্রকে মনে পড়েছে। বঙ্কিম যে তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকেই গ্রহণ করেছিলেন তা বোঝা যায়। নবীনচন্দ্রকে এই প্রবন্ধে বঙ্কিম 'উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যপ্রণেতা' বলেছেন, অপরদিকে মধুসূদন সম্বন্ধে মন্তব্য, 'আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট।' আর হেমচন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে উক্তি, 'তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারহিত।' পলাশির যুদ্ধ কাব্যের সমালোচনায় বঙ্কিম নবীনচন্দ্রকে কবি হিসাবে বিশেষ উচ্চ আসন দিতে পারেন নি। সে কথা আমরা পরে লক্ষ করব।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি

গ্রন্থটির (১৮৭৪ খ্রী) সমালোচনা সূত্রে 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' লিখিত। এই সমালোচনার এক-তৃতীয়াংশ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত।

সূক্ষ্ম শিল্প কি? Fine Artsএর বাংলা অনুবাদ হল সূক্ষ্ম শিল্প। শ্যামাচরণের গ্রন্থের নামপত্রে বাংলার সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'Fine Arts of Ancient India / with / A short sketch of the origin of Art.' 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের পাঠকের মনে হতে পারে বঙ্কিম Fine Artsএর সূক্ষ্ম শিল্প-নাম অনুমোদন করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' আছে, 'কাব্য, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। উরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া সূক্ষ্মশিল্প নাম দেওয়া হইয়াছে।' কিন্তু বঙ্কিম যে এই নাম আদৌ অনুমোদন করেন নি তা মূল প্রবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায়। মূলে বঙ্কিম বলেছেন, 'ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, শ্রীমানীবাবু তাহার অনুবাদ করিয়া সূক্ষ্মশিল্প নাম দিয়াছেন। নামটি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই।'

এই প্রবন্ধে বঙ্কিম একই সঙ্গে শিল্পতত্ত্ব, বাঙালীর সৌন্দর্যবোধশূন্যতা ও শ্যামাচরণ প্রণীত গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের গোড়ায় বঙ্কিম যেভাবে শিল্পের শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাকে সম্পূর্ণরূপেই এরিস্টটল অনুসারী বলা যায়।

এই বিষয়ক প্রবন্ধ বঙ্কিম পূর্বে লেখেন নি, পরেও না। সে দিক থেকে রচনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। গ্রন্থসমালোচনার সুযোগ না এলে তিনি এ-বিষয়ে কখনো কিছু লিখতেন কিনা বলা যায় না।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত গ্রন্থ বঙ্কিম কর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বৃত্রসংহার কাব্যের প্রথম খণ্ড (১-১১ সর্গ) প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিম কর্তৃক লিখিত সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের দুই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। বৃত্রসংহার প্রকাশের পূর্বেই হেমচন্দ্র কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১ খ্রী), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪ খ্রী), কবিতাবলী (১৮৭০ খ্রী) বৃত্রসংহারের পূর্বে প্রকাশিত।

বঙ্কিম হেমচন্দ্রের কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের কবিতা মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যাতেই তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর হেমচন্দ্রকেই বঙ্কিম তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গ্রহণ করেন। মধুসূদন বঙ্গদর্শন-কালের কবি ছিলেন না। বঙ্গদর্শন প্রকাশের এক বৎসর পরেই মধুসূদনের মৃত্যু (২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রী) ঘটে। মধুসূদনের কাব্যের প্রতি বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধা ছিল, অপর দিকে হেমচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আগ্রহ ও প্রীতি।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্ববর্তী কালে হেমচন্দ্র বঙ্কিমকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করেন নি। অন্তত, হেমচন্দ্রের কবিতার প্রতি বঙ্কিম যে অনুরাগী ছিলেন— এমন কোনো প্রমাণ নেই। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের (১৮৬৬ খ্রী) প্রতিটি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে সংস্কৃত বাংলা বা বিদেশী সাহিত্য থেকে এক-একটি উদ্ধৃতি আছে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের মধ্যে কেবল মধুসূদনের বিভিন্ন কাব্য থেকে ছয়টি উদ্ধৃতি আছে, অপর কোনো বঙ্গীয় কবির উদ্ধৃতি নেই। মধুসূদন ব্যতীত দীনবন্ধু মিত্রের রচনা থেকে একটি মাত্র উদ্ধৃতি আছে— সেটি তাঁর নাটক থেকে গৃহীত।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে The Calcutta Review পত্রে বঙ্কিম 'Bengali Literature' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তাতেও তিনি তাঁর সমকালীন কবি-বর্গের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনের কবিতার আলোচনা করেছেন— হেমচন্দ্র বা অপর কারও নয়। উক্ত মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, 'His rightful place in Bengali literature is perhaps the highest.'

এই মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে (১২৮০ ভাদ্র) 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শীর্ষক রচনায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, 'কিন্তু বঙ্গকবি সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখনো রোদন করিব না।'

১৮৭১এ বঙ্কিমের 'Bengali Literature' প্রবন্ধে হেমচন্দ্রের নাম নেই, ১৮৭৩এ বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে হেমচন্দ্রের উচ্চপ্রশংসা। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩এর মধ্যে হেমচন্দ্রের নূতন কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি— এ-কথাটিও এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

মধুসূদনের জীবৎকালে বঙ্কিম মধুসূদনকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলে গ্রহণ করেছিলেন— তা দেখা গেল। তবে 'Bengali Literature' প্রবন্ধে মধুসূদন ব্যতীত অন্য কোনো কবির আলোচনা নেই বলে যে অপর কোনো কবির রচনা বঙ্কিম পছন্দ করতেন না— এমন কথা বলার অবকাশ নেই। হেমচন্দ্রের কবিতারও নিশ্চয় তিনি অনুরাগী ছিলেন, তবে হেমচন্দ্র বা অপর সকলের তুলনায় মধুসূদনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করেন।

বৃত্রসংহারের প্রথম খণ্ডের সর্গ সংখ্যা এগারো। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক সর্গেরই বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় সর্গের অন্তর্গত 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'— এই চরণটিকে বঙ্কিম 'প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি— মিলটনের যোগ্য' বলেছেন। 'বৃত্রসংহার কাব্য-মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে'— এ-কথাও তৎসহ যোগ করেন।

মিল্‌টনের সঙ্গে তুলনার পর সপ্তম সর্গে সমালোচক ইলিয়ড্‌ মহাকাব্যের সঙ্গে বৃত্রসংহারের বিচার করেন। কাব্য ব্যাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বর্ণিত নিয়তির স্বরূপ কি, গ্রীসীয় নিয়তি ও হেমচন্দ্রের নিয়তির মধ্যে প্রভেদ কোথায়, কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞান কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, বৃত্রসংহারে তার উদাহরণ কোথায়— ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে।

প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিম দুই স্থলে মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন। তবে সেটা সামগ্রিক কবিত্ববিচারের দিক থেকে নয়। ষষ্ঠ সর্গের আলোচনাকালে বলেছেন, 'দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধের বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য।' আর নবম সর্গের আলোচনায় বলেছেন, 'হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি।' এখানে প্রশ্ন জাগে, অন্যান্য কোন্ কোন্ বিষয়ে হেমচন্দ্র মধুসূদন অপেক্ষা সুপটু? এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে নেই।

প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিম হেমচন্দ্রের ছন্দ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ সহকারে আলোচনা করেছেন। হেমচন্দ্র কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন বাংলায় লঘু-গুরু উচ্চারণভেদ না থাকায় সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় অনুকরণ করা কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য, সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত বাংলা কবিতায় সহজেই ব্যবহার করা যায়। বঙ্কিমের এই বক্তব্য যথার্থ নয়, এখানে হেমচন্দ্রের বক্তব্যই ঠিক। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ছন্দ গ্রন্থে বলেছেন, 'বাংলায় এ জিনিস চলিবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নহে।' বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেউ কেউ, ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী কালে আরও কোনো কোনো কবি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা নিতান্তই চেষ্টামাত্র।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা-প্রবন্ধ বিহারীলাল যে বঙ্কিম কৃত বৃত্রসংহার সমালোচনার রীতিপদ্ধতি অনুসরণেই রচিত— এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। যিনিই দুটি প্রবন্ধ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়বেন তিনিই এ-কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। বঙ্কিমের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশের পর কখনো পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি।

যদিও রবীন্দ্রনাথের রচনাটির নাম বিহারীলাল, কিন্তু মূলত এটি বিহারীলালের বিশেষ একটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনার প্রেরণাতেই রচিত। সে দিক থেকে সমালোচনাটির শিরোনাম সারদামঙ্গল হলেও ক্ষতি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ওই প্রবন্ধে বঙ্কিম ও তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে; এবং উক্ত প্রবন্ধ রচনার মাত্র দুই মাস পূর্বে কবি সাধনা পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, 'বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন সেদিন হইতে এ পর্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোনো প্রভাব নাই। সাধারণে এখনকার সমালোচনা কেবল বিজ্ঞাপনস্তম্ভ সজ্জিত করিবার আয়োজন-স্বরূপে দেখে। যথার্থ রসবোধ এবং সূক্ষ্মবিচার প্রকাশ পায় এমন সমালোচনা বহুকাল দেখা যায় নাই। গ্রন্থ সমালোচনার ভার অনেক সময়ে অযোগ্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং অনেক কৃতবিদ্য লেখকও অত্যুক্তি কাল্পনিকতা এবং অবান্তর প্রসঙ্গে তাঁহাদের সমালোচনা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন; গ্রন্থের অন্তর্গত প্রকৃত সাহিত্যপদার্থকে প্রাধান্য না দিয়া

তাহার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্য কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়া পাঠকের চিত্তকে যথার্থ সাহিত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করেন। অন্য হিসাবে তাহার গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সমালোচনার হিসাবে তাহার মূল্য নাই। তাহাতে পাঠকদের মনে রসবোধ বা নির্বাচনশক্তির চর্চা হয় না।' ১৩০১এর বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বললেন, ১৩০১এর আষাঢ়ে সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি যে সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনা করলেন তার নাম বিহারীলাল।

গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। গঙ্গাচরণ ছিলেন নিজে বিচারক এবং বঙ্কিমের বিশেষ সুহৃৎ। গঙ্গাচরণের পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই অক্ষয়চন্দ্রের রচনা প্রকাশিত হয়। গঙ্গাচরণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে না পেয়ে পুত্রকে লেখেন, 'Why does not my friend Bankim Chandra send his Banga darsan to me?' বঙ্কিম যে গঙ্গাচরণের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন— তা এই পত্রাংশ থেকেও জানা যায়। বঙ্গদর্শনে এই সুহৃৎ প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন গ্রন্থকার সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় বলেন— 'তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না', তখন বুঝতে পারি সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ প্রকৃতির ছিলেন।

সমালোচনার গোড়াতে বঙ্কিম বলেছেন কাব্যের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য— বর্ণন এবং শোধন। 'যাহার উদ্দেশ্য কেবল যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' তাকেই বঙ্কিম বর্ণন বলেছেন। শোধন কি? এক শ্রেণীর কবির উদ্দেশ্য কেবল স্বরূপ বর্ণনা নয়। তাঁরা প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করেন। বঙ্কিম এই শ্রেণীর কাব্যকে শোধন বলেছেন। তাঁর মতে শোধন কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বৃত্রসংহার এবং বর্ণন কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ঋতুবর্ণন। শোধনশূন্য বর্ণন কাব্যের কবি গঙ্গাচরণের সঙ্গে বঙ্কিম ইংরেজ কবি ক্রাবের সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তেরও নামোল্লেখ করেছেন।

জর্জ ক্রাবের কবিতা বিশেষভাবে বর্ণনধর্মী। গ্রাম্য জীবনের প্রত্যক্ষ

চিত্র অঙ্কনেই তাঁর প্রবণতা। যতটুকু দৃষ্ট তার অতিরিক্ত কোনো কিছু চিত্রিত করায় ক্রাবের আগ্রহ নেই।

ক্রাব কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য আবিষ্কার করায় কি গঙ্গাচরণের গৌরব সূচিত হয়েছে? ঈশ্বর গুপ্তকে বঙ্কিম বর্ণন কাব্যের কবি বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল তিনি কবি হিসাবে উৎকৃষ্ট কি অনুৎকৃষ্ট? ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকায় গুপ্তকবি সম্পর্কে বঙ্কিম বলেছেন, 'সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।' এবং 'তাঁহার প্রকৃত পরিচয়, তাঁহার কবিতায় নাই.' এ-হেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে ঋতুবর্ণন কাব্যের সমগোত্রীয়তা আবিষ্কারে গঙ্গাচরণের কবিত্বের ঔৎকর্ষ প্রমাণ করে না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনায় কৌশলে ও স্পষ্ট ভাষায় এ-কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে গঙ্গাচরণ উচ্চশ্রেণীর কবি নন।

নবীনচন্দ্র সেন বিরচিত পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনে পলাশির যুদ্ধের সমালোচনা প্রকাশের পূর্বে নবীনচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র ছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। নবীনচন্দ্র লেখক, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক। নিজের লেখকের প্রতি সম্পাদকের সমালোচনা কিরূপ? অনুকূল না প্রতিকূল? নবীনচন্দ্র তাঁর আমার জীবন গ্রন্থে বলেছেন বঙ্কিম তাঁকে বাংলার বাইরন বলে প্রশংসা করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র যে কথা বলেছেন তা মিথ্যা নয়। বঙ্কিম তাঁর সমালোচনার উপসংহারে কবিকে বাংলার বাইরন বলেই 'প্রশংসা' করেছিলেন। কিন্তু কি ভাবে? বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, 'কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।' আমাদের প্রশ্ন, এ প্রশংসার যথার্থ স্বরূপটা কি?

নবীনচন্দ্রকে বাংলার বাইরন বলে উল্লেখ করা হলেও, বঙ্কিম কৃত সমালোচনাটি আনুপূর্বিক পাঠ করে স্পষ্টই বোঝা যায় সমালোচক সামগ্রিক-ভাবে পলাশির যুদ্ধ কাব্যের অপ্রশংসাই করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই বলেছেন পলাশির যুদ্ধের প্রথম সর্গে ষড়যন্ত্র সভার বর্ণনা অনাবশ্যক দীর্ঘ, কাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন। আর একস্থানে সমালোচকের মন্তব্য, 'এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্যের মন্থরগতি।' চতুর্থ সর্গ সম্পর্কে বঙ্কিমের উক্তি, 'ইংলণ্ডের রণজয় হইল— সূর্যাস্ত হইল— কবি সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজ মনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যানকাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে।' এবং 'এই কাব্যে কার্যের গতিরোধ করা কর্তব্য হয় নাই।' কাব্যের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য, 'কাব্যের বিষয়নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।' কাব্যমধ্যে ঘটনা-বৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটনে নবীনচন্দ্র তেমন শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। বৃত্রসংহারের বিশেষ গুণ, তাতে উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান বা বৃত্তান্তধর্মী রচনা, কিন্তু এতে অকারণে গীতিকাব্যের প্রাবল্য ঘটেছে, মূল উপাখ্যান বা নাটকের ভাগ প্রাধান্য লাভ করে নি। —এ-সকল বঙ্কিমচন্দ্রেরই মতামত।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাইরনের উল্লেখ করেছেন। বাইরনের সকল গুণ নবীনচন্দ্রের মধ্যে বর্তমান— এমন কথা তিনি কোথাও বলেন নি। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের দোষগুণ বিচার প্রসঙ্গে বাইরনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন মাত্র।

সত্যিই কি বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বাংলার বাইরন বলে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন? সে-কথা কেমন করে মানি? বঙ্কিমের নিজেরই মন্তব্য, 'চাইল্ড হেরল্ড বর্ণনকাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না।' এক জায়গায় বাইরনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের বিশেষ মিল লক্ষিত হয়, কিন্তু সেটা গুণগত নয়। 'চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোনো শক্তি প্রকাশ করেন নাই', তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উভয় কবিরই 'কিছু' শক্তি আছে। ক্লাইবের নৌকারোহণ অংশের বর্ণনায় নবীনচন্দ্র বাইরনের ন্যায় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, 'কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের যে পলাশির যুদ্ধ কাব্যটির প্রতি অনুকূল মনোভাব ছিল না তা নবীনচন্দ্রের উক্তির মধ্যেও ধরা পড়ে।

নবীনচন্দ্র তাঁর আমার জীবন গ্রন্থে লিখেছেন, 'একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি পলাশির যুদ্ধের রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে, পলাশির যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য— next, if at all, to Meghnad— মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগ্য। আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, তিনি লিখিলেন উহা বঙ্গদর্শন প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয়মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন— তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব সাধারণী প্রেসে ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।' শেষে সাধারণী প্রেসও নয়, ভিন্নতর প্রেস থেকে পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হল। নবীনচন্দ্র লিখছেন, 'বঙ্গসাহিত্য জগতে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন— It is unfortunate Hem should have made his *debut* before you.— তোমার দুর্ভাগ্য যে হেম তোমার পূর্বে আসরে নামিয়াছেন। কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম হেমবাবুর বৃত্রসংহারের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন বঙ্গদর্শনে উহার— পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ— সংবলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম এবং শুনিলাম এমন একটা লাইন সেক্ষপিয়ার কি মিল্‌টনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি তো কখনই হেমবাবুর প্রতি-যোগিতা করি নাই।'

নবীনচন্দ্র লিখেছেন পলাশির যুদ্ধ প্রকাশের পর বঙ্কিমবাবুর 'সুর' পালটে গিয়েছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্র আগাগোড়া যে বিবরণ দিয়েছেন, তা পাঠ করে আমাদের তো মনে হয়েছে গ্রন্থপ্রকাশের পরে ও পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি 'সুর' বা একটি মনোভাবই অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র তাঁর পলাশির যুদ্ধ কাব্যটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাইলে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে

লিখেছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে।' এখানে প্রশ্ন, কার অগৌরব? পলাশির যুদ্ধ কাব্যের, না বঙ্গদর্শন পত্রিকার?

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে লিখিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক-চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে ওগুস্ত কোঁৎ, জেরেমি বেনথাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ দার্শনিক মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে বঙ্কিম সর্বাধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতি। মিলের প্রতি বঙ্কিমের যে শ্রদ্ধা-মনোভাব লক্ষ করা যায়, অন্য কোনো পাশ্চাত্য মনীষীর প্রতি তাঁর সে পরিমাণ শ্রদ্ধানুরাগের প্রকাশ ঘটে নি। শুধু প্রবন্ধসাহিত্য নয়, বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্য জুড়ে একটি নাম মাঝে মাঝেই এসেছে—সে নাম জন স্টুয়ার্ট মিল। মিলের মৃত্যুর (১২৮০ বৈশাখ) অব্যবহিত পরেই বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে (১২৮০ শ্রাবণ) 'জন স্টুয়ার্ট মিল' ইতি শীর্ষক রচনায় মিলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।— 'মিলের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা কখনো তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই। তিনিও কখনো বঙ্গদর্শনের পরিচয় গ্রহণ করেন নাই। তথাপি আমাদিগের মনে হইতেছে যেন আমাদিগের কোনো পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে। ২৭ বৈশাখ তারিখের টেলিগ্রাম ২৮ তারিখে প্রকাশ হয় যে মিল সংকটাপন্নরূপে পীড়িত। পরদিন প্রাতে মিলের কুশল জানিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহচিত্তে সংবাদপত্র খুলিলাম, দেখিলাম যে চিকিৎসকেরা মিলের জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই দিবস অপরাহ্নে সংবাদ আইসে যে মিল নাই। ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জানি ইংলণ্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন। কিন্তু কেনই দুঃখ করি তাহা বলা যায় না। যে মহোদয় আপন বুদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন এই ঋণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি এতাদৃশ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যত্নসহকারে আবেদন করিলেই তাঁহার বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে, এরূপ মহাপুরুষ এতকাল পরে

বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, 'মিল নাই' এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।' এ-ছাড়া মিলের কথা কোথায় আছে? কোথায় নেই? বঙ্গদর্শনে ১২৮০র আষাঢ় সংখ্যায় 'সাম্যে', কার্তিকে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অন্তর্গত 'ইউটিলিটি বা দর্শনদ্বয়: হিতবাদদর্শন ও উদরদর্শন' শীর্ষক নিবন্ধে, চৈত্র সংখ্যায় 'বসন্তের কোকিলে', ১২৮১ পৌষে 'রজনী' উপন্যাসে, ওই পৌষ সংখ্যাতেই 'সেকাল আর একাল' শীর্ষক প্রবন্ধে, ফাল্গুনে 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত' শীর্ষক প্রবন্ধে, ১২৮২র বৈশাখে 'মিল ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে, কার্তিকে 'সাম্যে'র অন্তর্গত 'স্ত্রীজাতি' শীর্ষক অধ্যায়ে, ১২৮৪র জ্যৈষ্ঠে 'বাহুবল ও বাক্যবল' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং আশ্বিনে 'মনুষ্যত্ব কি' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে। অতঃপর পৌষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা'। এই প্রবন্ধে একই সঙ্গে মিলের কথা এবং যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থের সমালোচনা আছে। সমালোচকের মতে এই গ্রন্থ 'মনুষ্যজাতির দুর্লভ শিক্ষার স্থল।' বঙ্কিম কর্তৃক যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থ উচ্চ প্রশংসিত হয়।

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' ইতিহাসবিষয়ক রচনা হলেও, এই প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক মূর্তিটিই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমের যে নয়খানি প্রবন্ধ আমরা লক্ষ করেছি তার সব ক'টিই বিশেষ কোনো গ্রন্থের সমালোচনা সূত্রে রচিত। এই প্রবন্ধটিও এক হিসাবে তাই। বিখ্যাত ইতিহাসলেখক আবু ওমর মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীন প্রণীত প্রাচীন পারসিক গ্রন্থ তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজয়ের যে বৃত্তান্ত আছে, সে বিবরণ কতখানি সমূলক বা অমূলক— তারই তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র। এখানে বঙ্কিম একাধারে ঐতিহাসিক, সমালোচক এবং স্বদেশপ্রেমিক।

মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীন লিখিত মুসলমান অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙ্‌লা বিজয়ের বিবরণের সত্যতা বঙ্কিম আদৌ স্বীকার করেন নি। এই প্রবন্ধ রচনার দুই বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিম একবার মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীনের এই বিবরণের উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয়

করিয়াছিল, এ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিন্‌হাজ্‌‌উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন।' মিন্‌হাজ্‌‌উদ্দীন প্রদত্ত বিবরণের ঐতিহাসিকতা যথার্থ কতখানি— সে-বিচার বঙ্কিম সেদিন করেন নি। করেছিলেন দুই বৎসর পরে, ১২৮৯এর আশ্বিনে 'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়' প্রবন্ধে। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা যে যে কারণে মিন্‌হাজ্‌‌উদ্দীনের এই বিবরণের সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় শতবৎসর কাল পূর্বে সেই সকল কারণের উল্লেখ করে মিন্‌হাজ্‌‌উদ্দীনের বৃত্তান্তকে ইতিহাস না বলে উপন্যাস বলে গেছেন।

বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে সর্বত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী বলেছেন। কিন্তু মিন্‌হাজের রচনায় অষ্টাদশ অশ্বারোহীর উল্লেখ আছে। বঙ্কিম মিন্‌হাজের, রচনার প্রাসঙ্গিক অংশের সারার্থ উদ্ধৃতিচিহ্ন সহ উদ্ধার করেছেন। বঙ্কিম কর্তৃক উদ্ধৃত অংশ, 'নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।' ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Tabakat-I-Nasiri; translated from original Persian manuscripts by Major H. G. Raverty' গ্রন্থে আছে, 'The following year after that, Muhammad-i-Bakht-yar caused a force to be prepared, pressed on from Bihar, and suddenly appeared before the city of Nudiah, in such wish that no more than eighteen horsemen could keep up with him, and the other troops followed after him.' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭৪ খ্রী) গ্রন্থেও (১২৮১ মাঘ বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম কর্তৃক সমালোচিত) আছে, 'পর বৎসর বখ্‌তিয়ার একদল সেনা সজ্জীকৃত করিয়া বেহার হইতে অগ্রসর হইলেন এবং সহসা এরূপ বেগে নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন যে কেবল ১৮ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সঙ্গী হইতে পারিল, তদনন্তর অন্য সৈন্যচয় পৌঁছিল।' বঙ্কিম ১৮ জন অশ্বারোহীর স্থলে ১৭ জন লিখলেন কোন্ সূত্র থেকে? এ-তথ্য তিনি Stewartএর The History of Bengal গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে মিন্‌হাজের রচনার যে সারার্থ উদ্ধার করেছেন তা

Stewartএরই ইতিহাস গ্রন্থ থেকে অনূদিত। সেখানে আছে, 'On his arrival in the vicinity of the city; he concealed his troops in a wood, and, accompanied by only seventeen horsemen, entered the city.' কেবল এই গ্রন্থেই অষ্টাদশের স্থলে সপ্তদশ অশ্বারোহী বলে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধ রচনাকালে Stewartএর গ্রন্থটিই ব্যবহার করেছিলেন। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব বৎসর Raverty অনূদিত ইংরেজি গ্রন্থ Tabakat-I-Nasiri ছাপা হয়। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রবন্ধটি লেখেন, তখনও এ-গ্রন্থ তাঁর হাতে এসে পৌঁছায় নি। ঐতিহাসিক ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ইতিহাসবিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির প্রথম সংস্করণ বর্তমান সম্পাদককে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, বন্ধুবর ডক্টর অশোক ভট্টাচার্যের একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি অতি যত্ন ও সতর্কতা সহকারে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন সারস্বত লাইব্রেরীর সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিভাস ভট্টাচার্য।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্র কৃত

সাহিত্য সমালোচনা

দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ

অবকাশরঞ্জিনী

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখনো এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে, মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয়ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম, দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল-বধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক

অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র।

উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোনো কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে, কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনে রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত এবং অভিনয়োপযোগী তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে একখানিও নাটক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus", "Manfred", "Faust", ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোনো ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। এ কথা কতক দূর সংগত বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে, অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক খণ্ড-

কাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোনো একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রগ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold"কে ওই নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ওই দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতি-কাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোনো বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে যেখানে বস্তুগত কোনো পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোনো বস্তু থাকে যে তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয় "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শত গুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সংগীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সংগীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সংগীতের

সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায়, যে কোনো নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক তুইটি, স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য। এই তুইটি পৃথক্ পৃথক্ তুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এই রূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতি-কাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেম-বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

"অবকাশরঞ্জিনী" কতকগুলি খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ। ইহার প্রণেতা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। তিনি যেই হউন, তিনি সুকবি এবং বিশুদ্ধরুচি; তিনি যশস্বী হইবার যোগ্য। ভরসা করি পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে আপনার পরিচয় দিবেন।

এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল, এবং স্নেহময়, তৎসমুদায় অপূর্বশক্তিসহকারে উদ্ভূত করিতে পারেন। সেই অপূর্ব শক্তিটি কি, তাহা আমরা সবিস্তারে বুঝাইব।

যখন হৃদয়, কোনো বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখনো ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অনন্থমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ এই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ংগম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;

ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও একথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোনো কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্যার্থ, বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন?

সহজেই অনুমেয় যে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পরসম্বন্ধীয়, বা কোনো কার্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখনো নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, উক্তিমাত্রোদ্দিষ্ট, অব্যক্তব্য কথা, যাহা গীতিকাব্যের আত্মা, তাহার উদাহরণ স্বরূপ, অবকাশরঞ্জিনী মধ্যগত "পিতৃহীন যুবক" ইত্যভিধেয় কাব্য হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"যামিনীর সুমধুর নূপুর নিক্কণ
ঝিল্লিরবে ভাসিতেছে দিগ্ দিগন্তর,
পাখার প্রহারশব্দ করিছে কখন
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কলকল রবে গঙ্গা সাগরসদন
যাইতেছে, অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন।

* * *

জীবন, পবন, এবে উভয়ে অচল,
নিদ্রিত ধরায় আর নাহি বহে শ্বাস,
একটি পল্লব নাহি করে টল মল,
একটি ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস।
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
দিবসের শ্রম নর জুড়ায় এখন।

* * *

কণ্টকশয্যায় যদি রাখি কলেবর,
চিন্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে;
ঝরিয়াছে এক বিন্দু, ঝরিবে অপর,
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন মন্দিরে
প্রবেশেন যদি, তবে আইসে সঙ্গিনী
যাতনিতে অভাগায় স্বপ্ন কুহকিনী।

* * *

মায়াবলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস তরণী মম, জীবনের স্রোতে,
লয়ে যায় যথা, আহা! শৈশবে যখন
কেলিনু মনের সুখে; সাগর কপোতে
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।
সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার,
খেলাইত যেই মতে ঊর্মিমালাসনে,

নব জীবনের জলে, চুম্বি অনিবার
আশার মুকুল শত সোনার কিরণে ;
দেখাইয়া গত সুখ চিত্র মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্রান্ত বিষণ্ণ অন্তর।

* * *

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত দ্রব করি
গৃহরূপ রঙ্গভূমে ফিরিব আবার ?
দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ ঈশ্বরী
সহ গেলে স্বর্গপুরে ; করিয়া আঁধার
ভকত হৃদয়াকাশ, শূন্যগৃহে পড়ি,
গুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি।"

উপরোদ্ধৃত কয়েক চরণের কবিত্ব অতি মনোহর। বিশেষ সাগর কপোতের এবং ভগ্ন ঘটের উপমা দুইটি অতি মনোহর।

যে সকল মোহিনী সৃষ্টির গুণে কবিগণ চিরস্মরণীয় হয়েন, অবকাশরঞ্জিনীতে তাহার কিছু নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অপিতু কোনো রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে সকল সৃষ্টি বা অবতারণায় সক্ষম যে সকল মহাত্মা, তাঁহারা এ জগতে অতি দুর্লভ। সে সকল গুণ না থাকিলেও অবকাশরঞ্জিনীর কবিকে সুকবি বলা যায়। তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দচতুর। কতকগুলা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দচতুর বলি না ; অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগে দক্ষ, তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণ পথে আইসে। এই কবির সেই শব্দ প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যো-পযোগী সামগ্রীগুলিন আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন তাহাই উজ্জ্বলতা

বিশিষ্ট করেন। অবকাশরঞ্জিনীর যে কোনো স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা ছন্দের পরিপাট্য হেতুক নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

"সখিরে! কি কব করম কথা!
প্রণয় ভাবিয়া, পাষাণ হৃদয়ে
চাপিয়া, পাইনু ব্যথা।
কুসুম কলিকা, জিনিয়া বালিকা,
ছিলাম যখন সই,
প্রণয় কেমন, জানি নাই আমি,
শৈশব আমোদ বই।
মধুকর ভ্রমে, বিকাশিনু দল,
ভাসিয়া যৌবন জলে,
নিদারুণ কীট, পশিয়া মরমে,
শুকাল বিকচ দলে।
সখি! যায় প্রাণ যায়, দংশন জ্বালায়,
বাঁচিনে পরাণে আর,
জীবন মৃণাল, এই ছুরিকায়,
কাটিব করেছি সার॥"

অল্পবয়স্ক কবিগণ, বিনানুকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অনুকরণপ্রিয় হয়েন। অবকাশরঞ্জিনী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠে শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়কে স্মরণ হইবে।

"ছিলে তুমি অয়ি গঙ্গে! হিমাচল শিরে,
তরল রজতাসনে রাজরানী প্রায়
ভূতলে পতিত এবে তাই ধীরে ধীরে,
কাঁদিতেছ মনোদুঃখে একাকিনী হায়!
আমি ভাবি শুনি মম দুঃখের কাহিনী,
কাতরে কাঁদিছে আহা! নগেন্দ্র নন্দিনী।"

নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির ন্যায় রচনা পাঠ করিয়া হেম বাবুকে স্মরণ হয়, এবং উভয়ের আদর্শ বাইরনকেও মনে পড়ে ;

নাচরে ময়না নাচরে আবার,
দুই (দিই ?) করতালি নাচ আর বার,
চন্দ্রানন হতে ঢাল একবার,
ঢালরে সংগীত অমৃতের ধার,
কি কটাক্ষ ! হলো জেনেছি এবার,
কাশী নরেশের হৃদয় বিদার ।

আমরা এমন বলিতেছি না যে এই কবি অন্য লেখকের নিকট ঋণী। পশ্চাদ্বর্তী লেখকগণকে পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণী হইতেই হয়। সেই পরিমাণের অতিরেকে ইনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইনি নিজমানস প্রসূত কবিত্বরত্ন যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থমধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে পরের নিকট ঋণী বলিলে অন্যায় নিন্দা করা হয়।

১২৮০ বৈশাখ

দানবদলন কাব্য

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ, প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-সকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে কোনো মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান্, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেন না আমরা আগেই জানি যে এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালীয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব কবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র

দানবদলন কাব্য। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভবানীপুর; শ্রীব্রজমাধব বসু।

সৃষ্টি করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত ; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয় ; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্য-প্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতার স্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়পর, মনুষ্যের ন্যায় প্রণয়শালী, ঐশ্বর্যলুব্ধ, বীরমদমত্ত, এবং চাতুর্যপ্রিয়। মানব-চরিত্রগত এমন একটি মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতি-মানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে ; কেন না কবি মানুষিক বল বুদ্ধি সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই ; এবং তাহার নিয়ম এই যাহা প্রকৃত তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্‌টনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্‌টন কোনো পক্ষকেই সম্যক্ প্রকারে মানবপ্রকৃতি-বিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য

হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্বিক পাঠ করে না। আনুপূর্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি, ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোনো কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ, যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্বত, পর্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব, দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয় বিষয়বিরত, সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায়, কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর, বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই, কুমারসম্ভব

কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্বতোৎপন্না উমা, শরীররূপিণী; তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাজ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্‌টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভবকে বিশেষ ন্যূন বলিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোনো ভাষার কোনো মহাকাব্যে আছে, কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবীত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি কবিতার্থের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত "Like the bud bit by an envious worm" &. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা

এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা নামে পাষাণরানী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায়, তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নবীন কবি। নবীন কবি হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ কাব্যে বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া অসংসাহসের কাজ বটে। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধে তাবৎ পক্ষ অতিমানুষপ্রকৃতিবিশিষ্ট। একপক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণের শাস্তা অসুর কুল, পক্ষান্তরে সর্বনাশিনী মূর্তি-বিশিষ্টা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। কাব্যপ্রণয়নে বিশেষ কৌশলবিশিষ্ট কবি ভিন্ন ইহাতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, নবীন কবি রামচন্দ্র বাবু ইহাতে অনেক দূর কৃতকার্য হইয়াছেন। যে কৌশলে প্রাচীন কবিরা, দৈবচরিত্র মনুষ্যের সহৃদয়তাস্পদ করিয়াছেন, ইনিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত প্রথানুসারে সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। অসুরগণকে মানব-প্রকৃত করিয়া উপাখ্যানের মনোহারিতা সম্পাদন করা যে কৌশল, অনেক কাল হইল পৌরাণিকেরা তাহার উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কবি প্রথমে চণ্ডীর উগ্রচণ্ডা মূর্তিকে মানবমূর্তি সদৃশী করিয়াছেন। চণ্ডীকে কেবল মাত্র অতিপ্রকৃত বলবীর্যের আধার কল্পনা করিয়া অন্যান্য বিষয়ে, তাঁহাকে মানব-প্রকৃতিশালিনী করিয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এরূপ খণ্ড উদাহরণে প্রকৃত কৌশল কিছুই বুঝা যায় না। তবে রামচন্দ্র বাবুর বর্ণনাশক্তি এবং শব্দচাতুর্যও মনোহর, তাহা পাঠকের নিকট পরিচিত করিবার মানসে আমরা এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিতে সংকোচ করিলাম না।

হেথা মনোরমা বেশে ভবেশ ভাবিনী
অধিত্যকা দেশে ভ্রমে, প্রমোদ কাননে

গুচ্ছের ;—পশিছে কভু, মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
শোভার পিঞ্জরে যেন সুখে শুক পাখী।
কখন তুলিয়া ফুল, আঘ্রাণ লইছে।
কভু দাঁড়াইছে গিয়া আলবালোপরি
প্রস্রবণ পাশে ; মরি জলের ফোয়ারা
পাশে, রূপের ফোয়ারা যেন ! কখন বা
শিলা পট্টে বসি ধনী ঈষৎ হাসিছে,
কৌতুক আবেগ মনে সম্বরিতে নারি ;
আবার উঠিয়া পুনঃ হেট মুখে দেখে,
কুসুমকলিকাকুল কেমনে ফুটিছে।
বৃক্ষশাখা ধরি কভু, এক দৃষ্টে চাহে,
দূরগত কোকিলের কুহুরব পানে।—
রঙ্গে একাকিনী ভ্রমে উল্লাসে বরাঙ্গী,
আপনার ভাবে হয়ে আপনিই ভোর !
হেন কালে আসি দূত, রসিক সুগ্রীব,
অধরে মধুর হাসি, ভাবে ঢুলু ঢুলু,
দেখা দিলা সে উদ্যানে মন্দ মন্দ গতি।
দেখিয়া তাহারে গৌরী, হাসিলা অন্তরে।
ভাবিলা, মায়ার জালে পড়েছে শিকার।
ধীরে ধীরে আসি দূত কহিতে লাগিল,—
"কি গো ধনী, কি করিছ, কি ভাবে ভ্রমিছ ?
আবার এলাম আমি তোমায় দেখিতে।
হেট মুখে কি দেখিছ কুসুমের দলে ?—
রূপের কি প্রতিবিম্ব পড়েছে উহাতে ?
ঈষৎ হাসিছ কেন, আমায় দেখিয়া ;
প্রদীপ্ত রবির বিভা মন্দীভূত করি ?
রূপের সাগর তুমি ; কি রূপ আবার,
এক দৃষ্টে চাহি দেখ এদিক ওদিক ?"

পুনশ্চ,

শুনিয়া চণ্ডের খেদ, লাজে অনুতাপে,
মনে মনে তবে সতী, কহিতে লাগিলা,
"কি কুকর্ম করিলাম ? হায় কেন আমি
দেবগণ লাগি অস্ত্র ধরি অকারণে
বধিলাম দৈত্যবরে ; বীরত্ব রতনে
ফেলিলাম কাল অন্ধকূপে ; কাটিলাম
শক্তি রথচক্র ; মরি, ভাঙ্গিলাম পুনঃ
সে সাহস ধ্বজ, ঘোরতর যুদ্ধঝড়ে !
হায়, নিবাতে উদ্যত আমি দীপাবলী
সংসারের !—দৈত্যকুল সৃষ্টির আলোক ।
কি করি এখন ; যাই রণস্থল ছাড়ি
কৈলাসেতে ; দেবভাগ্যে যা থাকে তা হোক

পুনশ্চ,

ভয়ংকরা বেশে কালী তবে দিলা হানা,
লট্ট পট্ট কেশ জাল ঘূর্ণিত নয়ন,
চঞ্চল স্থূলাঙ্গ মরি ক্রোধের উত্তেজে !
হানিল সুতীক্ষ্ণ বাণ টঙ্কারিয়া ধনু
শুম্ভের স্কন্ধেতে ; অঙ্গে বিন্ধিয়া ফলক,
কাঁপিতে লাগিল শর ; মরি (ভয়ে যেন)
ছুঁয়েছে এহেন বীর তেজস্বী শরীর ।
রোষে ভূমে পদাঘাতি, দর্পে নাড়ি ঘাড়
রুক্ষ দৃষ্টে চাহি ক্ষণে, হেরিলা ভীমায়,
অমরারি ; টান দিয়া ফেলি দিলা বাণ,
ঝরিল ঝর্ঝরে রক্ত তিতাইয়া তনু ।
ভীষণ কেশরী যথা গভীর গর্জনে
পড়ে করিণীর শিরে, হুহুংকারে বীর
আক্রমিলা কালিকায় অনিবার্য তেজে ।
করিলা ভৈরবীহৃদে ঘোর মুষ্ট্যাঘাত ।
কম্পিত শারীর যন্ত্র, শুম্ভিত শোণিত,

অমনি পড়িল দেবী মূৰ্ছিতা ধরায় ।
আলু থালু কেশজাল লুঠাইল ভূমে ।
ধরিয়া কেশের মুষ্টি, প্রচণ্ড বেগেতে
ঘুরাতে লাগিলা শুম্ভ আকাশে ভীমায় ;
মরি, মহামেঘ যেন ঘুরিতে লাগিল
ঘোর ঘূর্ণাবায়ুভরে । ঘূর্ণিত সংসার
হেরিলা নয়নে সতী ; গণিলা প্রমাদ ;
শুকাইল মুখচন্দ্র, উড়ে গেল প্রাণ ;
আকুল পরাণে তবে স্মরিলা রুদ্রেরে ;—
"নাথ, কোথা ওহে চিন্তামণি, মহাযোগী,
যোগ ভঙ্গ করি ক্ষণ নিরখ দাসীরে !
বিষম সমরে প্রভো হয়েছি কাতর,
দুর্মদ দৈত্যের করে বুঝি প্রাণ যায় ।
তব বলে বলী দৈত্য অনিবার্য তেজ,
(শক্তি আমি), মোর শক্তি লাঘবে হেলায়
অবশ হয়েছে অঙ্গ তব প্রেমাধার,
শুকায়েছে কণ্ঠ নাথ, তব প্রেমপায়ী,
শূন্যময় দেখি দিক, আঁধার সংসার,
মহাকাল, মহাশূলী, তুমি হৃদয়েশ
থাকিতে আমার । দেহ মোরে বল শম্ভু,
পতির বলেতে বলী ভার্যা চিরকাল ।
এহেন লাঞ্ছনা আর সহিতে না পারি,
কেশে ধরে দৈত্যরাজ ঘুরায় আমায় ।"
দীর্ঘশ্বাসে মনানল তেয়াগিলা সতী ।
তাড়িত বারতাবহ তারযন্ত্র যথা,
নড়িলে এখানে, নড়ে দূরগত যন্ত্র,
ব্যাকুল সতীর মন আকুলিল মরি,
দূরগত যোগেশের তপঃমগ্ন মন ।
কেন বা না আকুলিবে ? মন তারযোগে,

প্রেমের তড়িত যাহে খেলে অবিরত।
মেলিলা অমনি আঁখি ত্যজি যোগ যোগী,
আকুল নয়নে ক্ষণ হেরিলা সংসার
শূন্যময় ; শূন্যময় হৃদয় আগার।
লট্ট পট্ট জটাজুট, অমনি উঠিয়া
লইয়া ত্রিশূল করে, ত্রিফল ফলিত
শত সূর্য তেজে, দ্বন্দ্বে জ্যোতি পরস্পর
উছলি কালাগ্নি মরি প্রত্যেক ভঙ্গিতে!

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছুক নহি। কেবল শুম্ভবধের বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিব, কেননা উহাতে কবির বিশেষ কবিত্বের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরে, সে রমণী শ্রেণী দেখাল্লা পবনে ;—
"দেখ ওহে প্রভঞ্জন, আসিছে বাসুকী
কেন আজি রণস্থলে? ত্রিদিব রাজ্যের
চাপে, ধরণীর ভার বহিতে না পারি,
কাতরতা জানাইতে আসিতেছে বুঝি।"
কহিলা পবন স্বনে, বিস্মিত অন্তরে,
দেখায়ে ; উজ্জ্বল রথে কমলা শুভ্রায় ;—
"ঐ বুঝি উজ্জ্বল ফণা ; ঐ বুঝি জ্বলে
তাহে দীপ্ত মণিযুগ, এই বুঝি দীর্ঘ
দেহ পশ্চাতে নিরখি ক্রমাগত, যাহে
জড়িত মন্দর নিজে ক্ষীরোদ মন্থনে?"
বিস্ময়ে চমকি পুনঃ কহিলা বাসব ;—
"একি দেখি, আইসেন পদ্মালয়া, সঙ্গে
লয়ে দৈত্য নারী কুলে ; ওই দেখ বামে
বসি, শুভ্রা সীমন্তিনী, দীপ্ত রথোপরে ;
কি জানি ফিরিল বুঝি মতি কমলার।"
অবাক্ হইয়া সবে দাঁড়াইলা রণে।

ক্ষণ মাত্রে আসি রথ উপস্থিত সেথা।
মহা সমরের গোল অভ্যন্তর দিয়া,
হেরিলা শুম্ভেরে; শুভ্রা, নিরশ্রয় বীর,
নাহি নিজ বল কেহ, ঘেরেছে শত্রুতে।
মেঘেতে বিদ্যুৎ যথা খেলিতে খেলিতে,
পড়ে শৃঙ্গধরে ছুটে, আসিছেন ছুটি
কালী, ত্যজি সৈন্য নাশ, আস্ফালিয়া শূল
বধিতে শুম্ভেরে। আস্তেব্যস্তে, হাহাকারে
অমনি ধাইলা শুভ্রা, ঠেলি সেনাকুলে,
কালিকার দিকে, নাহি করি প্রাণে ভয়।
পড়িলা আসিয়া পদে; বাহুলতা দ্বারা
বাঁধিলা চরণযুগ; আকুল পরাণে
কহিতে লাগিলা;—"রক্ষ, রক্ষ, রক্ষাকালী,
জীবিত ঈশ্বরে মোর; ক্ষম ক্ষেমঙ্করী;
বধো না আমার, মাতঃ প্রাণের ঈশ্বরে!
বধিবে তাঁহারে যদি, বধ আগে মোরে
ঘুচায়ে জঞ্জাল; লতা পাতা কাটি আগে,
কাটে কাটুরিয়া তরুবরে। গলায় পা,
দেহ গো আগেতে মোর, পরে করো যাহা
হয়, অভিরুচি তব।" কাঁদিতে লাগিলা,
রানী লুটাইয়া মাথা, মহা আর্তনাদে।
ধীরে ধীরে আসি লক্ষ্মী, ভাষিলেন তবে,
"মাগো, ক্ষান্ত হও মহামায়া, বধো নাক
আর শুম্ভে; না চাহি গো, মুক্তি আর।
থাকিব গো চিরবদ্ধ, সেও মোর ভাল,
দৈত্য নারীকুল দুখ সহিতে না পারি।"
বিস্ময়ে তুলিয়া মুখ, হেরিলেন চণ্ডী
সম্মুখে কেশব প্রিয়া, বিনীত ভাবেতে
মাগিছেন কৃপা সতী শুম্ভের লাগিয়া।

অসুর অঙ্গনাকুল এ দিকে সকলে
জুটিলা আসিয়া ক্রমে রণক্ষেত্র মাঝে।
হাহাকার রবে দিক পুরিলা সকলে।—
পড়িলা আছাড়ি কেহ বিবশা হইয়া
ছিন্নমূল তরু সম মৃত পতি দেহে।
কেহ প্রাণপুত্র মুণ্ড কুড়াইয়া লয়ি
চুম্বি পুনঃ পুনঃ উহা, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ;
কেহ প্রিয় সহোদর ধরি গলদেশ
ভাসায় শরীর মরি, নয়নের নীরে !
উচ্চৈঃস্বরে ঝোরে কেহ স্বজনের গুণ।—
ঘোর আর্তনাদে দিক্ ভাসিয়া উঠিল !
স্তম্ভিতা হইয়া কালী দেখেন সে ভাব।
টলিল দারুণ মন বামাদল দুখে ;
ছাড়িয়া নিশ্বাস সতী নামাইলা মুখ।
গভীর চিন্তায় মরি হইলা অচল !

মাথা তুলি পুনঃ শুভ্রা, কহিলা বিনয়ে ;
—"মাতঃ, শুভদে গো তুমি, জগদম্বা তাহে ;
এই কি তোমার কাজ ? বিনা অপরাধে,
আপন সন্তানগণে করিলে বিনাশ।
তব কি উচিত মাতঃ, একেরে তুষিতে
অপর সন্তানে বধা ? কি দোষে গো দোষী,
বল এ অসুর কুল, এ কমলপদে ?
কি দোষ পাইয়া, বল গো জননী, তুমি
ধরিলে সংহার মূর্তি দৈত্যকুল প্রতি ?
কি জানি তোমার ধর্ম ; যা হোক তা হোক
বরদে গো, আর কিছু নাহি চাহি আমি,
দেহ মোরে ভিক্ষা মোর জীবিতের প্রাণ।
ত্রিলোকের আধিপত্য না চাহি গো মোরা ;
দেহ উহা ইন্দ্রে ; মোরা বরং চিরকাল,

অনুগত হয়ে তাঁর। এই ভিক্ষা মোর।"
ধীরে ধীরে আসি শুম্ভ কহিলা শুভ্রায় ;—
"হেন নীচ অভিলাষ কেন দৈত্য রানী,
বীরত্ব রতন খনি ? থাকিবারে চাহ
চিরকাল হীন ভাবে ইন্দ্রের অধীনে ?—
মরিতে ত হবে, কিবা স্থির সংসারেতে ?
না ভাঙ্গি পর্বতচূড়া, কভু অবনত
নহে ধরাতলে ; তবে কেন অধীনতা
স্বীকারিব বাসবে, জীবন থাকিতে।
দৈত্য কুল চূড়া আমি, ত্রিলোকের প্রভু।"
আসি কালিকার পাশে কহিতে লাগিলা ;
—"মাতঃ, কেন গো ভাবিছ আর ? বধ
মোরে, না চাহি ধরিতে আমি এ জীবন
আর। দেখ পুড়ে খাক মোর হয়েছে হৃদয়,
স্বজন বিয়োগ শোকে। কি সুখে গো আর
রব এ সংসার মাঝে। মরিতে তো হবে ;
মরি তবে এই বেলা তোমার হাতেতে।
গুরুপত্নী তুমি মাতঃ, মোর ; তব হাতে
মরিলে যাইব চলি বৈকুণ্ঠ লোকেতে।
শুনেছি প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ জননী,
বিনাশিবে দৈত্য কুল ; পাল সে প্রতিজ্ঞা।
না পালিলে প্রতিজ্ঞা গো ঘোষিবে কলুষ
তোমার জগৎ ; ধর অস্ত্র আমি তব
ছেলে, রাখি তব পণ, নিজ প্রাণ দিয়ে।
সাধি গো সন্তান কাজ সংসার মাঝারে।"
সখেদে নিশ্বাস ছাড়ি তুলি তবে ঘাড়
চাহিলা শুম্ভের পানে কাতরে ভবানী।
সম্মতি হইল ভাবি যেন দৈত্যরাজ,
প্রচণ্ড বেগেতে আসি পড়িলা লাফায়ে

কালিকার শূলে, হৃদে পশিল ফলক ;
ঝর ঝর রক্ত ধারা বহিল প্রবেগে ;
অচৈতন্য বীরবর পড়িলা ধরায়,
মুদিয়া তেজস্বী আঁখি ; নিবিল সহসা
মরি যেন কাল ঝড়ে দৈত্য কুল বাতি !

শুভ্রার বৃত্তান্ত সুকবিসুলভ কৌশলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এই কবির বর্ণনাশক্তি মধ্যে মধ্যে প্রশংসনীয় কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা আর উদ্ধৃত করিতে পারি না। তাঁহার প্রযুক্ত উপমাগুলিন অনেক সময়ে অতি মনোহর।

তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দ বীররস-প্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দ রামচন্দ্র বাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।

এই কবির ভাষা কোনো কোনো সময়ে কর্কশ বোধ হয়, কিন্তু সেটি আমাদের সংস্কারের দোষে হইলেও হইতে পারে। এই কাব্যে মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাষাটি আর একটু পরিষ্কার করিলে ভাল হয়।

সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, দানবদলন কাব্য ইদানীন্তনের নূতন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ইহার সকল স্থান সমান নহে—অনেক দোষও আছে—বিশেষ দেখা যায় যে, কবির কবিত্ব শক্তি অদ্যাপিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই! তথাপি ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকৃতি ইঁহাকে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি দিয়াছেন ; কাল সহকারে শিক্ষা এবং অভ্যাসের সাহায্যে ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে বিশেষ উচ্চাসন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১২৮০ জ্যৈষ্ঠ

বহুবিবাহ

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত কি না? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে আমরা ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোনো অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ংগম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন বোধ হয় তাঁহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয়

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা। শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগেরই মুখে বহুবিবাহ প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্‌কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা তদ্‌বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোনো সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার, বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার, বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ, বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহ প্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এদেশে যত দূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলী জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি

যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও, হুগলী জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয় জন বহুবিবাহ পরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদন পরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদন পরায়ণ কিনা সন্দেহ। এই অল্প-সংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোনো উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোনো রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোনো পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায়, বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিযা, অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা কুক্কুর দেখিলেই, তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা

স্বীকার করিলাম বহুবিবাহ এদেশে বড় চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেননা, পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যবলে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতি-শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া, আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন দেশসুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসম্বন্ধে কৃতকার্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন, স্বেচ্ছাপূর্বক, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোনো একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ-

দিগের এই দশা, তবে আপামার সাধারণের কথার আর কাজ কি ? বাস্তবিক, মানবাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোনো সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন্ কালে, কোনো সমাজে, ওই সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি, সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর, যে তাহা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা, যদি কোনো সমাজের অদৃষ্টে কখনো ঘটিয়া থাকে, বা কখনো ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে পূর্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতকদূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতকদূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে, বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্মবিরোধী নহি ; হিন্দুধর্ম, পরিশুদ্ধ হইয়া, প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদিগের কামনা। তাই বলিয়া, যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত

আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত; তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেননা সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি,—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ-প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামত ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ি যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন সন্দেহ নাই।” এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক, যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মর্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন, কেননা ইহা শাস্ত্রসম্মত। তদ্ভিন্ন, যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে, হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ পরায়ণ, সেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন,

* বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমেতুমৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥—বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩।

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে।—"সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!" ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভার্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা, হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব বর্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ "লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের"* অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে "মুখঝামটা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া, স্বামীর উপর তর্জন গর্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া, স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোনো সুখ হইল না", তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সদ্যই অন্য দারগ্রহণ করিবেন। যাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, "কিছুতেই তোমার মন জোগাইতে পারিলাম না—আমার মরণ হয় তো বাঁচি"—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃ

দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, “মহাশয় কন্যা দান করুন।” এতদিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেন না নথ নাড়া দিবার দিন কাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষবিষকে সংসার জয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন “সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!” বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন! —আমাদিগের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্মশাস্ত্রের বলে, বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে “লোকহিতৈষী” বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী তাঁহাদের মুখ্য

উদ্দেশ্য এই যে বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোনো চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন বোধ হয় না। কিন্তু রাজ ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী" "ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু * * * বিবাহ্যাঃকচিদেবতু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই যে, এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা-বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা

অর্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদিগের ব্যাকরণের গুণে একস্থানে "ক্রমশোবরা" ও "ক্রমশোঽবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে; আরবী কায়দা হেলে দোলে না; বিশেষ মুসলমানদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যক নাই।" আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোনো উক্তিই ন্যায়সংগত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব, আমাদিগের সামান্য বিবেচনায়, ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোনো দিকে কোনো ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার কর্তব্য যে, যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণ-স্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধা নিবারণার্থে যে চুরি করে সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থে যে চুরি করে সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জনীয়, কেননা সে কাতরতা-বশতঃ এবং অলজ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে।

তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ, মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্মশাস্ত্রের প্রতি গদগদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মধ্যে যে কয়জন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচজনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন

করেন নাই।* গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলংকার বিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন যে বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।" আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদিগের নিতান্ত বাসনা ছিল যে আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব যে, "মহাশয়েরা কোন্ সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।" আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল এবং এখনও শ্রেণী বিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে যে, কোনো বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল যে, এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, "শ্যালা, তুই কি জানিস্"—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই চারি কথার পর পরস্পরকে "পাষণ্ড" "ব্যলীক" "নরাধম" বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকেরাও পরস্পরের মতভেদ দেখিলে অমনি, ভিন্ন মতাবলম্বীকে "মূর্খ" "ধৃষ্ট" "অসৎ" "মিথ্যাবাদী" এবং অন্যান্য উচ্চার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা

। ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নকে একটু ক্ষমা করিয়া স্পষ্ট বলেন নাই।

ও সংসর্গ বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না ; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দুষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্য। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাটবিশিষ্ট নৈয়ায়িক-দিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষার অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটুফুল, ছেঁড়াচুল এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্রলোকেও দাস হয় উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ রুচির পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই। গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্যনির্ণয় পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের

অত্যুক্তি ভ্রমে মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোনো শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

পুনশ্চ ৬ পৃষ্ঠায়—

"ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"

তর্কবাচস্পতি যেমন ইচ্ছা তেমন মনুষ্য হউন, সাধারণের তাহাতে ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। তিনি কুলোক হইলেও, বিচার্য বিষয় কেবল এই যে তাঁহার উক্ত কথাগুলি যথার্থ, না অযথার্থ? যদি সেগুলি অযথার্থ হয়, তবে তাঁহার চরিত্রের কথা উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে। আর যদি সে কথাগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ যেমন চরিত্র হউন না কেন, তাহা যথার্থই থাকিবে। রাগ, দ্বেষ এবং অবিমৃশ্যকারিতা বোধ হয় পৃথিবীতে এত সুলভ যে আমরা অন্যের প্রতি তাহার আরোপণ না করিলেই ভাল করিব। এই নৈতিক উক্তির প্রমাণস্বরূপ, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠক মহাশয়কে উপহার দিব।

"যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্বে বঙ্গদেশবাসী

অধুনা মুরশিদাবাদনিবাসী, সর্বশাস্ত্রদর্শী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন মহোদয় যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন, অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ বচনের ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য করিতে হইবেক; তাহা হইলে আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে; তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, সেরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দেশ করিতেছি, আমি শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি এবং এক্ষণেও নির্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই নিতান্ত নির্বিবেক হইয়া এরূপ গর্বিত বাক্যে, এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসংগত নির্দেশ করিয়াছেন।”

পুনশ্চ ২৩৯ পৃষ্ঠায়—

“ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; ***

এজন্যই এরূপ অসংগত ও অশ্রুতপূর্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্বাচীন না হইলে সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয় প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।”

এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণস্বরূপ, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত

করিয়া* স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল যে, বোধ হয় সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তাহার একটি শব্দ পরিবর্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধ হয় তেমনই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় সন্ধান করিবেন, আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে উপাখ্যানপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। নেত্ররোগীর উপাখ্যান ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে। যে সকল উপাখ্যান নীতিবিরুদ্ধ, বা অশ্লীল, বা অন্য কারণে ভদ্রের অনাদরণীয়, তাহা কদাচিৎ রসবাহুল্যের অনুরোধে সহ্য যায়। ধর্মশাস্ত্রের বিচার মধ্যে যদি উপন্যাস ন্যস্ত হইল, তবে তাহা একটু সরস হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক শাশুড়ী কুন্তীর দৃষ্টান্তানুবর্তিনী, তাঁহার বধূ দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তানুকারিণী, এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপি-কৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভৎসনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনের এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না। কটুবাক্যে

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৪৯—২৫০ পৃষ্ঠা।

আনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতা জ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্বদা দেখা যায়। আমরা তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না, কেননা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষ সিদ্ধি হইতেছে, কদর্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে। কিন্তু যেখানে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় বিজ্ঞ, মান্য এবং সুপণ্ডিত লেখকের এরূপ প্রবৃত্তি, তখন বঙ্গীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকের মঙ্গল কামনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে কোনো ভবিষ্যৎকালে ভদ্রতা ও সভ্যতা স্থান পাইতে পারে, এই বাসনায়, ভিন্নজাতীয় গণের নিকট চিরকাল আমরা ইতরজাতি বলিয়া পরিচিত না থাকি, এই ইচ্ছায়, আমরা এই কুপ্রথার নিন্দা করিলাম। আমাদিগের এই বিশেষ আশঙ্কা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লেখকের আদর্শস্বরূপ, তাঁহারা এ নজির দেখিয়া অপরিমিত রসিকতা উদ্গীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই আশঙ্কাতেই আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ যে বাক্য উপদেশ বাক্যের ন্যায় শুনায়, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতে আমাদের লজ্জা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সদনুষ্ঠানপ্রিয়তা গুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যাঁহাদিগকে তিনি কটু কথা বলিয়াছেন—তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা গঙ্গাধর রায় কবিরাজ, ইঁহাদিগকে আমরা চিনি না; তাঁহাদিগের পক্ষতাবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি দোষারোপ করিব এমত কোনো কারণই নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তকের উত্তরে ইঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের লিপিপ্রণালীরও প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপিকার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের

অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই এসকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, "আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাঁহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।"

যে কয়টি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোনো ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

৫। যে শাস্ত্রীয় বিচারে ভদ্রলোকের বর্জনীয় ভাষার অনুশীলন হয়, তাহা পরিহার্য।

উপসংহার কালে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে

বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।

১২৮০ আষাঢ়

মানস বিকাশ

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতিকবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালার' প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গীতিকাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনারহিত। অবকাশরঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যপ্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্যনিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "মানস বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্র।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই ; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোম্‌ৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশ-ভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোনো কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখনো উত্থাপন করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমুলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয়

আর্যগণ অনার্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষের অনার্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য সকল। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকারিণী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য তেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্রখনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়,

সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসী-রুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোম্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকৃচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব-শূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমল জালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যা পতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসংকুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান

মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্নসমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।

আধুনিক বাঙ্গালী গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধপ্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

মানস বিকাশ এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা মানস বিকাশ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—"মিলন" ও "কাল" নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। "কাল" হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়,
নর নারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥
দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারও নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ নীরে কর নিমগন,
পদযুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কতশত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়নজলে।

এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি ইংরেজি গন্ধ কয়। প্রাচীন বাঙ্গালী গীতিকাব্য লেখকেরা এ পথে যাইতেন না;

কালের কথা গায়িতে গেলে, সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্য জাতির নয়নজল তাঁহাদিগের মনে পড়িত না; এ সকল জ্ঞান ও বুদ্ধি বিস্তৃতির ফল। প্রাচীন কবি, কালের গতি ভাবিতে গেলে, আপনার হৃদয়ই ভাবিতেন; নিজ হৃদয়ে কালের "দুরন্ত দংশন" কি প্রকার, তাহার বিষ কেমন, তাহাই দেখিতেন। কাল সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কবিতা তুলনার জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

এখন তখন করি, দিবস গোয়াঙনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোয়াঙনু
খোয়নু এ তনুয়াক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোয়াঙনু
খোয়াঙনু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে তনু যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সোপিয়া লেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, ইত্যাদি।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়-

পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।

ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালী কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোনো মূর্খ না মনে করেন যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণীনির্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালী কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুস্দন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য. এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক এবং মানস বিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাঁহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি ; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি কোনো প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদিগের কোনো সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোনো দোষই নাই।

মানস বিকাশের কবিতার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা "মিলন", কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না। তাহা কর্তব্য নহে এবং তদুপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। এজন্য "প্রেম প্রতিমা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

আইল বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,

তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়,
তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়।
তব আবির্ভাবে, ভুবন মোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী তলে,
আঁধার আকাশে হিমাংশু কিরণ
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন,
সুখ সলিলে ॥
কে বলে কেবল নন্দন কাননে,
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে
দেখ চেয়ে এই সংসার কাননে
ফুটেছে কত !
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কতশত ফুল প্রফুল্ল বদনে
ফোটে নিয়ত !

ইংরেজ শিষ্য এইরূপে প্রেমবর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠীধারী বৈরাগিগণ কৃত প্রেমবর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্বে আর একজন হাফ ইংরেজ হাফ জয়দেব চেলার কৃত কবিতা শুনুন ; এ কবিতারও উদ্দেশ্য প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা।

মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে
কমল কাননে।

কমলিনী কোন ছলে, ডুবিয়া থাকিবে জলে,
বঞ্চিয়া রমণে।
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি, লঙ্ঘিব কেমনে।
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে, এ তিন ভুবনে ॥
ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যাম দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, নাচে সদানন্দ মনে
রাধিকা কেন ত্যজিবে-রাধিকা বিলাসী ॥

*

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি।
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী ॥
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু নিধি, আমারে দিয়াছে বিধি,
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

এক্ষণে বৈষ্ণবের দলের দুই একটা গীত—

সই, কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি-পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম ॥
হিয়ার হিয়ায়, লাগিবে লাগিয়ে,
চন্দন না মাখে অঙ্গে।

গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥
তিলে কত বেরি, মুখ নিহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে,
তেঁই সদাই নয় নাম ॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমতি পীরিতি,
আর কি জগতে আছে ॥

পুনশ্চ,

সোই পীরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছনি দিবে পরাণে ॥
মো যদি সিনান, আগিলা ঘাটে,
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়ে,
বাহু পশারিয়া রয় ॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়ে
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়ে নেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস, যেদিকে যেদিন
সেদিকে সেদিন থাকে ॥

মনের আকুতি বেকত* করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥

পরিশেষে আমাদের গীত কাব্যের আদিপুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক—তাঁহার কবিতার রস বড় গাঢ়। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী—তত গাঢ় রস বঙ্গদর্শনের পাঠকদিগের সহিবে না। তবে যাত্রাকরদিগের কৃপায় অনেকেই তাঁহার দুই একটি গীত বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন—

প্রথম, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতি ভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায় শেখরে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সংকীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সংকীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী।

তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতার, সেই গতি পরিসর পথবর্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই। নদীর স্রোতের ন্যায়, বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে, বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে।

চতুর্থ, মানস বিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে।

* ব্যক্ত

"মানস বিকাশ" অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদ্য-বিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

১২৮০ পৌষ

আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প

একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চলো, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করো। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা সুখাভিলাষী তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্মে, কেহ অধর্মে; কাহারো সুখ কার্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা করো; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় করো, সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখো, ঘর্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও—ঘটি বাটি পিতল কাঁশাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন করো। সুন্দর দেখিয়া পাখি পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা করো, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখনো এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষনীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্মল, পাপ

সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরি, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০ [সংবৎ]।

সংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু, অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহংকারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্যজনিত সুখ চিরনূতন এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেক্লে প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকা-কারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গণ্ডমূর্খ দলের

মধ্যে আধুনিক অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীবাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন্, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউম, আদাম স্মিথ, হণ্টর, কার্লাইল থাকিতে ওয়াল্টর স্কটকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই। যথা ইন্দ্রধনু, আকাশ প্রভৃতি।

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে; যথা পুষ্প।

কতকগুলির বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে; যথা উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য সৃজনের জন্য এই কয়টি সামগ্রী, বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি-সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য।

যে সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সংগীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, শ্রীমানীবাবু তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দিয়াছেন। নামটি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। যদি কালিদাস প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান যে কুমারসম্ভব, শকুন্তলা রচনা "শিল্প" বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই, এবং যে শিল্প বিদ্যার প্রভাবে ইলোরার প্রকাণ্ড গুহাট্টালিকা খোদিত হইয়াছিল, তাহাকে "সূক্ষ্ম" বলা একটু অসংগত হয়। যাহা হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না।

কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য "সূক্ষ্মশিল্পের" এত প্রকৃতিগত বিভেদ যে, এক্ষণে অনেকেই ইহাকে আর "সূক্ষ্মশিল্প" মধ্যে গণ্য করেন না; নৃত্য গীত, সামাজিক সামগ্রী, একা বিদ্বানের নহে, সুতরাং উহাও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং "সূক্ষ্মশিল্প" নাম করিলে, আপাততঃ চিত্র, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যই মনে পড়ে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানীর গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এই তিন বিদ্যার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে, সাধারণতঃ সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য।

তৎপরে গ্রন্থকার অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এদেশের শিল্পকার্য যে প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু শ্রীমানীবাবু ইহার যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিজ্ঞাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। অশোকের পূর্বকালিক স্থাপত্য বিদ্যার কোনো চিহ্ন এদেশে যে বর্তমান নাই, তাহা আপাততঃ স্বীকার করিতে হইবে।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত

হইয়াছে, তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর কোনো জাতির অপেক্ষায় স্থাপত্য দক্ষতায় ন্যূন ছিলেন না। ভারতবর্ষীয়েরা কাব্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থাপত্যে যেরূপ তাঁহাদিগের প্রাধান্য প্রতিবাদের অতীত, বোধ হয় সেরূপ আর কোনো বিদ্যায় নহে। ফর্গুসন সাহেবের যে কয়টি কথা শ্রীমানীবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও তাহা পুনরুদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন যে—

"ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্ যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোনো জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। * * * ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য-গঠন-নৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলংকার প্রাচুর্যই আশ্চর্য ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠনগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশসকলের সৌন্দর্য ও মাধুরী এবং প্রধান গঠনটির সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্বস্থলেই দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

ভারতবর্ষীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে ইজিপ্ত এবং গ্রীশীয়দিগের পশ্চাদ্বর্তী বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পিলপার ভূষণ এবং যে সকল মনুষ্য-মূর্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজয় করিয়াছেন।"

শ্রীমানীবাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্বতাভ্যন্তরে খোদিত হইয়া প্রস্তুত ; দ্বিতীয়, যে সকল পর্বতের বাহ্যাভ্যন্তরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।

প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্যের উদাহরণ স্বরূপ ইলোরার গুহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"একটি অর্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্বতাভ্যন্তর অর্ধক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্যে যতপ্রকার গঠন ও অলংকার পারিপাট্য থাকিতে পারে, সে সকলই এই গুহাসকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, গুম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য—ইহার কিছুরই অভাব নাই।

অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। কোনো কোনোটি তিন তলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌গুহাস্থ ইন্দ্রসভা অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটি হাঁড়ি বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপড়ি দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্‌টা হাঁড়ি বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত নহে। কারণ, হাঁড়ির গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুতঃ শ্রীসম্পন্ন, তাহাতে ইহার মনোহর ভাস্কর্য এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশিলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্তুলাকার ও পলবিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশিলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলকশ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশদ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—

দ্বাদশটি সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব কারুকার্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্রসভার যে চিত্র প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠক ইহার সুচারু রচনাচাতুর্য কিয়ৎ-পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ইন্দ্রসভার অন্তঃপাতী তিনটি গুহা আছে। একটি ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধমূর্তি সকল খোদিত আছে; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় গুহাগর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ় পুরুষ এবং শার্দুলপৃষ্ঠে উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'ডুমার লয়না' অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেবদেবীরও মূর্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্বতীর বিবাহব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে

ইলোরার আর একটি প্রসিদ্ধ গুহার নাম 'কৈলাস'; ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নির্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে এবং এতন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্তি সকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিনদিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্তি সকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ,

ইহা পাঁচটি মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্বাপেক্ষা উচ্চ ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল খোদিত গজ ও শার্দুলযুক্ত উপানোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটি চাঁদনীর মধ্যে এত দেবদেবীর মূর্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দু দেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি—এ সকলই একখণ্ড প্রস্তর, ইহার কোনো অংশ গ্রথিত নহে। এই সমস্ত পর্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি কীর্তি সকলের মধ্যে চিলামক্রমের মন্দিরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"চিলামক্রমের মন্দিরগুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ এবং ৩০ পাদ উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্বদিকে একটি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে। ইহা দীর্ঘে ২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ ; ইহার সম্মুখে এক চাঁদনী আছে, উহা সহস্র স্তম্ভে সুশোভিত ! উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্তি সকল ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দেবদেবীর আদর্শে খোদিত। কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য কীর্তি আছে যে, তাহা ভূমণ্ডলের অন্য কোনো স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্কোণাকার স্তম্ভ-শ্রেণী-সংলগ্ন এক প্রস্তর-শৃঙ্খল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা ভিত্তিসংলগ্ন নহে, কেবল মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সংযোজিত, *অবশিষ্টাংশ শূন্যে ঝুলিয়া আছে। অপর এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে*

এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মূর্তি সকল এবং এরূপ দুইটি মনোহর শোভাসম্পন্ন পিল্‌পা আছে যে, প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ গ্রীকজাতিও উক্ত প্রকার গঠনে ঐরূপ অলংকার যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

মহাবালীপুরের মন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "এই নগরস্থ প্রধান মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে সুশোভিত মনুষ্যমূর্তি সকল অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। একজন ইউরোপীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোনো কোনো অংশ বিশেষতঃ মুখশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্করবিদ্যা-বিশারদ কানবাকৃত মূর্তি সকলের তুল্য।"

তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের প্রধান উদাহরণ, ভুবনেশ্বর। আবু পর্বতস্থ জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অলংকার সম্বন্ধে শ্রীমানীবাবু লিখিয়াছেন যে, তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

"বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহুবায়াসসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি-কার্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদনী লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সে কৃষ্টফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্মমন্দির সকল এই জৈন চাঁদনীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্তি ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০০ অষ্টাদশ কোটি টাকা এবং চতুর্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।"

ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যের দুইটি মাত্র দোষের উল্লেখ আছে, বিজনতা এবং আলোকাভাব।

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্যের গৌরব, স্থাপত্য-গৌরবের ন্যায় নহে, তথাপি আমাদিগের প্রাচীন ভাস্কর্য, আধুনিক দেশী ভাস্কর্যাপেক্ষা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়।

শ্রীমানীবাবু কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

"বর্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক

সাহেব মহোদয় ভুবনেশ্বরান্তর্গত এক মন্দির ভিত্তিতে একটি দুর্গাদেবীর মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও সুখস্পর্শ রক্তমাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না! বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় ভাস্কর্যের ইহা একটি প্রধান ধর্ম—সর্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণ-গোচর হয়। পাঠক! বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ সুখস্পর্শ ও কোমল গঠন এবং মনোহর অঙ্গবিন্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের লক্ষণ। অতএব আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন যে, আর্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অলংকৃত করিয়া অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নির্মাণ করিয়াছিলেন! এই জাতীয় শিল্পের অপর একটি উৎকৃষ্ট ধর্ম "প্রয়োজন সিদ্ধি" অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে যে যে কার্যে নিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন, দৃষ্টিমাত্রে দর্শকের মনে সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধন-ভাবের উপলব্ধি হয়। আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্যে এই মহদ্‌গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন!"

পরে মথুরার বিখ্যাত পুত্তলিকা সকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে উহা গ্রীকশিল্পীনির্মিত সাইলেনসের প্রতিমূর্তি বিবেচনা করেন। শ্রীমানীবাবু এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে উহা হিন্দু শিল্পকরের খোদিত কৃষ্ণলীলা বর্ণন। সাইলেনস নহে—বলরাম। যদি এই ভাস্কর্য হিন্দু প্রণীত হয়, তবে

* গ্রীক্ জাতিরা মথুরা পর্যন্ত আসিয়াছিল, এ কথা অসম্ভব বলিয়া শ্রীমানী মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর। ডক্টর সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীক জাতীয়েরা মধ্য-ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিত। মহাভাষ্যের বিখ্যাত উদাহরণ "অরুণৎ যবনো সাকেতম্," শ্রীমানী মহাশয় কি বিস্মৃত হইয়াছেন? যখন গ্রীকেরা অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল, তখন মথুরায় না আসিবে কেন?

সে হিন্দু গ্রীকদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

নশ্বর চিত্রপট অযত্নে রাখিলে, প্রস্তরাদির ন্যায় অধিককাল স্থায়ী হয় না; এজন্য শ্রীমানীবাবু অজন্তা ও বাঘের গুহাস্থিত ফ্রেস্কো পেণ্টিং ভিন্ন আর কোনো চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ তাঁহাকে নাটকের সাক্ষিতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সে প্রমাণ আমরা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচনা করি না; কবির স্বভাব এই যে প্রকৃত অনুৎকৃষ্ট হইলেও, তাহাকে উৎকর্ষ প্রদান করেন। উত্তরচরিত ও শকুন্তলায় যে চিত্রবিদ্যার পরিচয় আছে, ততদূর নৈপুণ্য যে ভারতবর্ষীয়েরা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

যাহা হউক, শ্রীমানীবাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে শ্রীমানীবাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টিলাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এত কথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি।

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটা কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালী বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্মশিল্প সম্বন্ধে কোনো কথা বলা, দুই চারি জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন, অন্যের কাছে ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি বোধ হয় এত অল্প অন্য কোনো সভ্যজাতির নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য-প্রিয়তাই সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ এবং বাঙ্গালীরা এখনও যে সভ্যপদবাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। তাঁহারা গৃহিণীর

মুখখানি সুন্দর দেখিতে ভালবাসেন বটে—এবং কতকটা পুত্রবধূর সম্বন্ধেও তাই, কিন্তু অন্যত্র সে সৌন্দর্যপ্রিয়তা তত বলবতী নহে। সংগতি থাকিলেও ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া বালিশ, দুর্গন্ধ মসি এবং তৈল-চিত্রিত জাজিম, আমরা বড় ভালবাসি। পরিধেয় সম্বন্ধে রজককে বঞ্চনা করাই বাঙ্গালী জাতির জীবনযাত্রার একটি প্রধান বীরত্ব। গৃহমধ্যে, পূতিগন্ধবিশিষ্ট, কদর্য কীটসংকুল, দৃষ্টিপীড়ক কতকগুলি স্থান না থাকিলে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। বরং বন্যপশু পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকে, তথাপি বাঙ্গালী নহে। ঈদৃশ জাতির সৌন্দর্যস্পৃহা কোথায়? এবং যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, তাহার আদর কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাঙ্গালার সূক্ষ্ম শিল্পের এত দুর্দশা।

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাহাতেই অসংখ্য সন্তানসন্ততি লইয়া গর্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাব-বশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা, বাঙ্গালীর দারিদ্র্য জন্য। সৌন্দর্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রী-গণের অলংকার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রকন্যার বিবাহাদিতে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও, সমাজ-শৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালী, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্মের দোষ; যে ধর্মানুসারে, উৎকৃষ্ট মর্মর প্রস্তুত হর্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায় কোনমতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা করো। দেখিবে এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারিজন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভালমন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালীর উত্তমাধম বিচার-শক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। সৌন্দর্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।

১২৮১ ভাদ্র

বৃত্রসংহার

এক

হেমবাবু এই কাব্যখানি অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্বাচন সাধ্য নহে; অর্ধনির্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা বুঝিতে পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য পড়িয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া এরূপ সুখ অনেক দিন ঘটে নাই। এবং শীঘ্র ঘটিবে না। এরূপ কাব্য সর্বদা জন্মে না।

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফূরিত করিয়াছেন। পাতালে, বৃত্রজিত, নির্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমোনিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেমবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি

বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম খণ্ড। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

গ্রন্থকারদিগের ভাবসংকলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" হেমবাবু মিল্‌টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড়ধূম্রল ঘোর" সেই পাতাল পুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ংকর—

চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন ;
ঝটিকার পূর্বে যেন ঘন ঘনোচ্ছাস
বহে ঘুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া পুনর্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নিবেশিত বাক্যগুলিতে একটি অর্থ আছে; বোধ করি সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই; উদাহরণ স্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে ;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য, সর্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।

ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।

বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা ?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া ?

এই সর্গে অনেকস্থানে আশ্চর্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরু শিখরে নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব মাধুর্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দন বনে বৃত্র-মহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্যের ন্যায় একটি মাধুর্য আছে—কিসের সে মাধুর্য, পবন মাধুর্যের ন্যায় তাহা অনির্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্রাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভালো লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সঙ্গে মহাসুরের মহিষী

নন্দনে বসিয়া এই কথপোকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্ত্যভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখনো কখনো ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি— মিল্‌টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

অন্যান্য দেবতা পাতালবাসী, কিন্তু কাম ও রতি স্বর্গ ছাড়িতে পারে নাই—তাহারা বৃত্র এবং মহিষীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। নহিলে অসুরলব্ধ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়? দূরদর্শী কবি এটুকু ভুলেন নাই। বৃত্তের আজ্ঞানুসারে, কাম শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী, এক দেবী মাত্র সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতলে নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভারূঢ় হইয়া আদেশ করিলেন যে, ভীষণ নামে পরাক্রান্ত অসুর তাঁহাকে আনয়ন জন্য প্রেরিত হউক। প্রথমে কৌশল, কৌশলে না পারে বলে আনিবে। এদিকে সূর্যাদি দেবগণ মন্ত্রণানুসারে স্বর্গ নিরোধ করিতে আসিতেছিলেন। বৃত্র সেই সংবাদ পাইলেন। বৃত্রাসুর সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না,—তখন প্রধান রক্ষক, যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া দেবাগমন অনুমান করিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল। সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ন।

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ,
জ্যোতির্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ;

নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার ,
জানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতি যে প্রকার ;
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোভায় ;
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে আকাশপ্রান্তে ঘেরি চারি ধার ;
বহু দূরে এখন(ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।”

বৃত্রাসুরের সন্দেহভঞ্জন হইল, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

পরে চতুর্থ সর্গে, নৈমিষারণ্যে সুরেশ্বরী শচী, সখীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। স্বর্গচ্যুতিদুঃখ সখীর কাছে বলিতেছেন। সে সখী, অন্য কেহ নহে—বিদ্যুৎ। বৃত্রনাশের জন্য বজ্র সৃষ্টি হয়—বজ্রের অগ্রে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া কবি পাঠকদিগের নিকট কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে—যে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িবে, তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী—এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ সমালোচকেরা ইহা সমালোচনা করিবে। সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এ সময়ে ভবভূতির গর্বোক্তি মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রশংসা না করিবে, সে তাঁহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে। যে গ্রন্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী, সুসঙ্গতা এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিতা। আমরা বলিতে পারি না, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমাদিগের এমন একটু ভরসা আছে যে বজ্র সৃষ্ট হইলে, কাব্যমধ্যে সুন্দরী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্রের পরিণয় দেখিতে পাইব—চির-প্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ—বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে। আমাদিগের এ সাধ কি পূরিবে ?

চঞ্চলার নিকট শচীর বিলাপ, অতি মধুর অতি সকরুণ। ঐন্দ্রিলার বাক্যে যে মানুষিকতা দোষ লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে সে দোষ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর যোগ্য। বোধহয় এই প্রভেদ, কবির অভিপ্রেত। দেব দৈত্যে প্রভেদ অবশ্য রক্ষণীয়। তথাপি দৈত্যের দৈত্যত্ব থাকা আবশ্যক। অন্যত্র তাহা আছে। এই শচীবিলাপ হইতে, উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!
জাগ্রতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে !
নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় আঁচে,
স্বরগের মনোহর কায়া।
সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!
ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু,
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।
হায় এ মাটির ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতিনিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ।
শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকাল,
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ !

এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি,
সখিরে সকলি হেথা স্থূল !
নিত্য এ খর্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ,
কেমনে সে বাঁচে নর-কুল !
অমর—মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনি তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সহিব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোকে সহিয়া এ দুখ ॥

এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন—অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি।

কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন,
মেঘে যবে দুলাত পবনে !

কামদেব, প্রভুর আজ্ঞায় শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামদেব শচীর নিকট নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচী ধরিবার ব্যবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যে সংবাদ দিতে আসিলেন। তখন কবি, অকস্মাৎ প্রথম শ্রেণীর নাটককারের

ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। স্বদলত্যাগী অসুরদাস কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্বয় ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। চপলার ব্যঙ্গ তৎ-স্বভাবানুযায়ী, স্পষ্ট, উগ্র, তপ্ত এবং চাপল্যব্যঞ্জক। যথা—

শুনি নাকি মাল্যকার হৈয়ে এবে আজ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথাতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্যমনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবন পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি,
বেড়াইতে মনোহর বেশে।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্বলোকে সবাকারে,
শুন কাম এই তার শেষে॥

শচীর ব্যঙ্গও শচীর যোগ্য, গম্ভীর এবং গূঢ়ার্থ। যথা—

শচী কহে চপলারে, "গঞ্জনা দিওনা মারে,
সুখে আছে সুখে থাক কাম,
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পূরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্বঠাঁই,
চিরজীবী হ(উ)ক সেইজন॥
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়;
কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময়?"

কন্দর্পের উত্তর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কন্দর্প অপাঙ্গ ঠারে, শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।—
"সুখদুখ ইন্দ্রপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া,
যুকতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে, কোথায় সে ত্রিভুবনে
যুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা
না পাইব গিয়া অন্যস্থান॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চিরআশা
সুখ দুখ মনের খনিতে॥"

কন্দর্প বৃত্রকৃত শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শুনিয়া শচী প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া তপঃস্থিত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

পরে পঞ্চম সর্গে জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপলা ইন্দ্রাণীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে বা ব্রহ্মালয়ে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যিনি ইন্দ্রপত্নী সুরেশ্বরী তিনি বৈকুণ্ঠেও পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন চপলা ছদ্মবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শচীর উত্তর পাঠে সকলেরই আনন্দ জন্মিবে।

"শুনলো চপলা।
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা॥
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন।"

বলিতে বলিতে আস্যে হইল প্রকাশ
অপূর্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্যোদয়!
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন।

দেখিয়া চপলার বড় আনন্দ হইল। চপলা তখন সেই মূর্তির শোভনোপযোগী মায়াবন সৃষ্টি করিলেন।

মোহিনী-মোহকর মহীরুহ-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝরঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুলমঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরয অরধ, অরধ শশিশোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

পরে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মাতা পুত্রে অনেক সস্নেহ এবং সকরুণ কথোপকথন হইল এবং জয়ন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিলেন। এদিকে চপলা নন্দনতুল্য বনবিকাশ করিয়া আনন্দে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দূতসহ ভীষণ সেই স্থলে উপস্থিত।

তাহারা মর্ত্যে নন্দনশোভা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চপলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। পরে যাহা ঘটিল তাহা গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে হইবে—

চপলা কহিলা "কেন, কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোঁহে কর অন্বেষণ ?
এই সে নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে ;
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে ?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী ?
পার কি চিনিতে, বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানব—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বৈভব !"
ভাবিল ভীষণ, তবে হবে এই শচী
নিবারিতে ক্লেশ মর্তে আছে স্বর্গ রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল ;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার ;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার ;
স্বর্গ এবে শান্ত পুনঃ, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।
পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্বপদ বড়ই জঞ্জাল !
শিখাব উত্তম রূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী জানিহ নিশ্চয়।

পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত ?
নূতনে নূতন জ্বালা, বুঝে না সংকেত।"
শিব। বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যচর
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা ;
"থাক্ মেনে, আর কেন দেও পরিচয়—
মূর্খে'র অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয় ;
অহে দূত, বুঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা !
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা ;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে,
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"

চপলা অকুতোভয়ে দৈত্যদ্বয়কে শচীসমীপে লইয়া গেলেন। দৈত্যদ্বয় সেই প্রশান্ত গম্ভীর তেজোময় আকার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময়ে জয়ন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া ভীষণের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে। দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধবর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য ; মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ-বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য। উদ্ধৃত করিতেছি।

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী ;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উজ্জ্বল,
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে।

প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপুঃ দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জিয়া গর্জিয়া।

জাগ্রত, সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ, সিংহনাদে, অম্বর বিদারি।

অস্ত্রবৃষ্টি শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে ;
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি।

ত্রিদশ আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ়সংকল্প উভ দেবতা দনুজে।

অর্ণবের ঊর্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি অনুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাম ;
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে ;

অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;
কিংবা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে ;

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ স্বর্গ-বহির্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

বিরক্ত হইয়া দৈত্যপতি যোদ্ধৃবর্গকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবদত্ত ত্রিশূল আনিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিয়া বৃত্রপুত্র যুবা বীর রুদ্রপীড় তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।—

বীরের স্বর্গই যশঃ যশ(ই) সে জীবন।
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে॥

বৃত্রের উত্তরে যে বীরবাক্য আছে তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।

"অনন্ততরঙ্গময় সাগর-গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর ;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ ;—

"কিংবা সে গঙ্গোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত।

"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত ;
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখে চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল!
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পূরাইতে সাধ।

"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ্ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন, কলঙ্ক গভীর।

এমত সময়ে দূত আসিয়া ভীষণের বধবার্তা জ্ঞাপন করিল। তখন রুষ্ট দৈত্যপতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী নিষেধ করিল। স্বর্গদ্বারে দেবগণ যুদ্ধ করিতেছে ; কুমার কি প্রকারে সে ব্যূহভেদ করিয়া গমন করিবেন? নির্গমন করিলেই বা কি প্রকারে আবার পুরী প্রবেশ করিবেন? বৃত্র পুত্রের সঙ্গে শত যোদ্ধা ও তাঁহার হস্তে শিবত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিল, শূল না থাকিলে পুরী রক্ষা শঙ্কট হইবে, তখন—

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব প্রকাশিয়া,

কহিলা দানবপতি—"সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় ।"

রুদ্রপীড় ত্রিশূল লইল না। শত যোদ্ধা লইয়া শচীহরণে চলিল। এবং প্রতারণা দ্বারা দেবসৈন্য হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মর্ত্যে গমন করিল।

আমরা ছয় সর্গের বৃত্তান্ত লিখিলাম। আর পাঁচ সর্গ বাকি আছে।

আগামী সংখ্যায় তৎসমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

কাব্যনায়ক ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে দৃশ্যমান হইতেছেন। কোনো কোনো মহাকাব্যে আদ্যোপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন না,—সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রধান উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোনো কোনো মহাকাব্যে নায়ক, তাদৃশ সর্বদা দর্শনীয় নহেন; কার্যকালেই দেখা দেন। সংসারের এক একটি কার্য বহুজনের বহুতর উদ্যোগের ফল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্যোগ করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন প্রথমে দেখাইয়া, শক্তিধরের শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এইজন্য শ্রেণীবিশেষের মহাকাব্যে নায়ক কেবল ফলোৎপত্তি কালেই পরিদৃশ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের পর, আট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই; এবং বৃত্রসংহারে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত ইন্দ্রের দেখা নাই। ফলে যে একাদশ সর্গ এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে; ইহাতে ইন্দ্রকে আমরা অধিকক্ষণ দেখি না।

কুমেরুশিখরে ইন্দ্র তপস্যায় নিযুক্ত। কিন্তু সে তপস্যা ব্রহ্মাদি পৌরাণিক দেবতার আরাধনা নহে। তিনি নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। নিয়তি হেমবাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতা-দিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেমবাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্নপ্রকৃতি। হেমবাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণেতিহাসে নাম প্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশী শক্তির অতীত আর একটি শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তাঁহারাও সর্বশক্তিমান্‌ বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাদিগকেও উদ্যোগ করিয়া কার্যসিদ্ধ করিতে

হয় এবং সময়ে সময়ে বিফলযত্ন হইতে হয়। দশ বার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাদেব সমুদ্রমন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের তো কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাদির এই সুখ দুঃখ কোন্ শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন। সে দেহও অতি ভয়ংকর—

পাষাণের মূর্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।

মাধুর্য কি স্নেহ কিংবা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র; নিয়ত দর্শন
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে।

অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিংবা রুষ্ট কভু।

যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূর্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটি কৌতুহল ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্তন দেখিতেছেন,—

"পূর্বে সে নিরখি যেথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্বত এখন সেথা শৃঙ্গবিভূষিত,

লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া।

"গভীর সাগর পূর্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তন বালুকারাশিতে,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ-দেহ!

"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ;
সূর্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে!

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে, অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখনো কখনো প্রতীয়মান হয় এবং লিয়রে বা হামলেতে কখনো কখনো আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রাকৃত-বিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা উপরিধৃত কয় চরণে দেখাইয়াছেন। ইহার আর একটি উদাহরণ আমরা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিব।

নিয়তির দর্শন পাইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে, কি উপায়ে বৃত্র নিধন হইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবপুরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এ সংবাদ, স্বর্গদ্বারে সমবেত দেবগণ-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাস ধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গ, আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায়

কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। আমরা সর্গটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্তু সমুদায় উদ্ধৃত না করিলেও ইহার রাশি রাশি সৌন্দর্য, ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না—নিদাঘকালীন পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা আদ্যোপান্ত সুপ্রফুল্ল কবিতা পুষ্পে মণ্ডিত।

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী।

মাধুরী লহরী অঙ্গেতে যেমন,
উছলি উছলি চলে।

রতি নিকটে বসিয়া ফুল গাঁথিতে ছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন—তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন? তখন—

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
"বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে!
পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয়!
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশঃ-তৃষা হায় মিটে নাকি তাঁর
যশঃ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে,
সমরের দাহ সহি!"

কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে,
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি ॥
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে ;
"এই পালঙ্কেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে ;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার,
তুলি এই সারসন ;
কহিলা 'সাজাব রণবেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ ॥'
এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ !
কটিবন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ !
অতিপ্রিয় তাঁর অস্ত্র এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁর সাধে অঙ্গে ধরি কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিল আমার গায় !
এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ,
প্রিয়কর কতদিন
না পরশে ইহা, সমর রঙ্গেতে
রত তিনি অনুদিন ॥

সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম !"

এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। "আমিও রমণী, রমণীও শচী" ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শত পৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও বড় মধুর।

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিঙ্করী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানবমহিষী,
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !
আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে না কি তাঁর সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?

রতির মুখে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে,-

আমারে লইয়া, কন্দর্প-কামিনি,
চল সে পৃথিবী 'পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন
ধরিব পতির কর ;
এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥

ইন্দুবালা মর্ত্যলোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেবব্যূহ-ভেদ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালার স্মরণ পড়িল যে তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে অতি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সরলতাই, ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, যে সরলতা তিনি ইন্দুবালার চরিত্রের মূলস্বরূপ করিয়াছেন, সে সরলতা আর কোনো নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন নাই। শচীতে, চঞ্চলায় বা ঐন্দ্রিলায় সে সরলতা নাই। এইরূপে তিনি চরিত্র সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব কবিত্ব। সেই সরলতার সঙ্গে কবি অতি গুরুতর গাম্ভীর্যের সূত্র জড়াইয়া দিতেছেন ;—ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দর্য তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,

"পারিনা সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্যসেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;

দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী !
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে !
কাম-সহচরি, সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তর জ্বলে !”

কুলশত্রু দেবতার জন্য এই কাতরতা—“কত দেব-তনু পড়িয়া মূর্ছাতে !” এই চারিটি শব্দে হেমবাবু রমণী চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য ও মহত্বের সীমা দেখাইয়াছেন।

তখন রতি বলিতেছে,

“হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন !
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দয় এতই কেন ?”

তখন পতি নিন্দায় ইন্দুবালা গর্জিয়া উঠিয়া রতিকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল,

“শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে,
বীর তিনি রণ-প্রিয় !
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয় ॥

যাব শচীপাশে, করিব শুশ্রূষা,
যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিংকরী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী॥
মন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজ বাস ;
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস॥
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে গুটাইয়া, আরো সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা ;
যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে॥
পতির মালিন্য নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

তখন রতি যে কয়টি কথা বলিতেছে, তাহা মর্ম বিদারক,

"এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্প-হার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?
আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর
চরণে দলিয়া আগে।
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে।

মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃঙ্খল বান্ধিয়া পায়।
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায়!"

এই বলিয়া রতি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। ইন্দুবালাও কাঁদিতে লাগিল,

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল॥
কুরঙ্গী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূর রব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুল-মালা হাতে, ইন্দুবালা বামা
রুদ্রপীড় ভাবনায়॥

নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যামথিত সাগরবৎ এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গর্জন করিতেছে। নৈমিষে জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে রুদ্রপীড় আসিল,

হেনকালে রণশঙ্খ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতঙ্ক;
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া অচলচয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

কিঞ্চিৎ কাল প্রাচীন প্রথানুসারে বাক্‌যুদ্ধের পর, রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্‌ যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায় কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি। জয়ন্তের সঙ্গে শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেবদৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুংকারধ্বনি, বাণের গর্জন।
আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে শরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥
দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।
জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥
কেশরী-শার্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্বত-গহ্বর।
বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর॥
ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।

অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল ॥
ধরাতল টল টল,
নদীকূল কল কল
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ্‌দিগন্তে পতন ॥
হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্ধ দিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ
কিংবা ক্ষিপ্তগ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি ॥
যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,
যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুঙ্গ পর্বতপ্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥
কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,

ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব-যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে ।

তখন সূর্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড়, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রে শচী ও চপলা বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়া যে কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি সুমধুর। প্রভাতে জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ কামনা করিলেন শচী অন্তরে অমঙ্গল সূচনা দেখিয়া, জয়ন্তকে অন্য দেবের স্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধর্মাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে গেলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে।

অর্ধ দিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচ জন দানব বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিল।

না সহি দুর্বহ ভার,
অচল বিজুলি হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন।

কিম্বা যেন রাশীকৃত
চন্দ্র-রশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন।
শিরীষ-কুসুমস্তর,
যেন বা অবনী'পর
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন!
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অঙ্গার দীপ্ত মিশায় যেমন।

শচী আসিয়া পুত্রদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্তি অর্ধ অচেতন।

দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিকন্ধর নামে এক পামর অনুচর সঙ্গে ছিল; শচীহরণ জন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন। নিকন্ধর শচীর কেশ ধরিয়া তুলিল—

হায় মাতঙ্গজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তল লতা,
তুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর!

দৈত্যগণ স্তম্ভিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল। স্বর্গদ্বারে শংখধ্বনি শুনিয়া, শচীর মূর্ছা ভঙ্গ হইল। তখন শচী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন; সেই রোদন মর্মভেদী তূর্যধ্বনিবৎ। শুনিয়া ত্রিলোকের জীব কাঁদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন,

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু চঞ্চল,
তাহে যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

সর্গ শেষে একটি চমৎকার ছত্র আছে। শচীদেহ, অসুর, বৃত্র-সভাতলে অনিল। দেখিয়া, দৈত্যপতি,

চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন দাঁড়াইল।

দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতেছেন। আমরা কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব—পাঠকেরা, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরিক্ষ মাঝে
জ্যোতি-বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।

দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাঙ্কমণ্ডল
ধরাসঙ্গে, ধরা-অঙ্গ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সুচরিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করিয়া গগন।

ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো উর্ধ্ব শূন্যদেশে, অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু বেষ্টিয়া ভাস্করে।

সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর,
ভাতি-উপবীত অঙ্গে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ঙ্কর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া অরুণে,
সপ্ত কলানিধি সঙ্গে গ্রহ শনৈশ্চর।

দেখিলা সে কত শশী, কত গ্রহ হেন,
ব্যোমমার্গে ভ্রমে সদা ফুটিয়া ফুটিয়া,
উজ্জ্বল কিরণমালা জড়ায়ে অঙ্গেতে,
অপূর্ব ধ্বনিতে শূন্য করি আনন্দিত।

দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্রতুল্য লাগিল ভাতিতে।

ক্রমে ক্ষীণ—লীনপ্রায়—মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অঙ্গ, বাসব ক্রমশঃ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
নিম্নদেশে ছাড়ি চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর।

অদৃশ্য হইল শেষে—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উত্তরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।

শব্দশূন্য, বর্ণ-শূন্য, প্রশস্ত, গভীর,
ব্যাপৃত সে অন্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দিক,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্তি ছায়ার আকারে।

বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক যুড়ি
বিদ্যমান সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত-শরীরে,
মুহূর্তে মুহূর্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য-ভূষিত অষ্ট, প্রশান্ত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ষ, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি!

তথা শংকর এবং উমা, অতি গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের জল্পনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এমত সময়ে ইন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া, পার্বতী তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ইন্দ্রও সকল কথা বলিলেন। এমত সময়ে সহসা শিবের জটা কম্পিত হইল; ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্মুক স্খলিত হইল; গৌরীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িল। শচীর ক্রন্দনে কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছিলেন। শিব তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র গর্জিয়া উঠিয়া শংকরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সেই মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। মহাদেবও তখন বৃত্রের অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া, সহসা সংহার মূর্তি ধারণ করিলেন। পার্বতী ঈশানকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে দধীচির আলয়ে যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বজ্র সৃষ্টি হইবে।

একাদশ সর্গের আরম্ভে স্বর্গপুরে দৈত্যজয়োৎসব। শচীকে দেখিতে দৈত্যপুরবধূ ছুটিতেছে—তদ্বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকের কালিদাস কৃত, বর দেখিতে নাগরীদিগের গমন বর্ণনা স্মরণ হইবে।

এদিকে বৃত্র, বৃত্রপুত্র একত্র মিলিত হইলে উভয়ে আপন আপন যুদ্ধ সংবাদ কহিতে লাগিলেন—বৃত্র সগর্বে, রুদ্রপীড় বিনীতভাবে।

তৎপরে ঐন্দ্রিলা শচীর আনয়ন সংবাদে প্রীত হইয়া পুত্রকে তাহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর রূপের অনেক প্রশংসা করিলেন। পুত্রমুখে শচীর রূপের কীর্তন শুনিয়া ঐন্দ্রিলার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হউক—

"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণ।"

কৈলাসে পার্বতী এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে জানাইলেন। তখন মহাকালের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তৎফলে—

সংহার-ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকি গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত;
ভয়েতে ভুজঙ্গকুল পাতালে গর্জয়;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃঙ্গ পড়ে;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে;
টল্‌মল টল্‌মল ত্রিদশ আলয়;
মূর্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরুশিখর,
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর!
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিল কঙ্কণ;
রুদ্রপীড় অঙ্গে হৈল লোম-হরষণ;
নিঃশঙ্ক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" বলিয়া উঠিল॥

এইখানে অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড

সমাপ্ত করিয়াছেন। অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্য যে ব্যগ্র হইয়া রহিলেন, ইহা আমরা হেমবাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি।

খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ, নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র এবং কাব্যের নিগূঢ় মর্ম সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। কাব্যের বিশেষ বিশেষ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা ব্যতীত আমরা আর কিছুই করি নাই। আমরা যে পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত তুলিতে সক্ষম হইতাম না; গ্রন্থকার যে অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

গ্রন্থকারের ছন্দঃসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃসম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগপূর্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, "কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্ন-

শীল হইয়াছেন।” কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ ঔৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দঃ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার ভাব যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু “একোহি দোষোগুণ সন্নিপাতে-নিমজ্জতীত্যাদি।” আমরা বৃত্রসংহার পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি এবং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গালার সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

১২৮১ মাঘ-ফাল্গুন

ঋতুবর্ণন

কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য, কিন্তু সৌন্দর্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্যময় কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার, কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশস্পর্শ ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও তো কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত ; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা ; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে ; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ

ঋতুবর্ণন। শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত। চুঁচড়া সাধারণী যন্ত্র।

যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখনো ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতিপ্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতিপ্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালী কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে

নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোকচিত্র ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটি উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণবাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ উৎকৃষ্টরূপে আত্মকার্য সম্পন্ন করে। যথা—

ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর,
চতুর্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ংকর।
চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই—তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দক নাই। পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ,

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি
মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা;
নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব;

বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত-ভাব ॥

স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত—

কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি লহরে লহরে !

এক্ষণে গঙ্গাচরণবাবু প্রণীত দুই একটি "আলোকচিত্র" পাঠককে উপহার দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহদাহ বর্ণনা করিতেছেন,

বায়ু সঙ্গ চালি অঙ্গ দেখ অগ্নি রোষিছে,
শুষ্ক ঘাস, রজ্জু, বাঁশ শক্তি তার পোষিছে ;
দীপ্ত কায় মত্ততায় ভীম মূর্তি খেলিছে ;
রশ্মিভাগ রক্তরাগ পল্লিমাঝ মেলিছে ;
গেহচাল, বৃক্ষডাল, দাহি বহ্নি মাতিছে ;
শূন্যপুরি ভূরি ভূরি বিস্ফুলিঙ্গ ভাতিছে ;
ধূমরাশি ভাসি ভাসি উর্দ্ধদেশ যাইছে ;
ভস্মভার অন্ধকার অন্তরীক্ষ ছাইছে ;
উচ্চরোল সোরগোল তাপতেজ বাড়িছে ;
বংশরাজি বোম বাজি তুল্য শব্দ ছাড়িছে ;
ধেনুপাল আলথাল উল্ক ফুল্ক চাহিছে ;
দগ্ধকায় শারিকায় মৃত্যুগীত গায়িছে ;
"বারি আন" "চাল টান", লোকপুঞ্জ হাঁকিছে ;
দীনতায় কাতরায় দেবতায় ডাকিছে ;
দূর্বা, ধান, বস্ত্র, পান, অগ্নিমাঝ ডালিছে ;
বাষ্পবারি কুম্ভবারি একতায় ঢালিছে ;
আর্তনাদি তৈজসাদি আঙ্গিনায় নাড়িছে ;

কেহ কেহ বাস গেহ ভাঙ্গি ভূমি পাড়িছে ;
মুক্ত কেশ, ছিন্ন বেশ, দৌড়াদৌড়ি ধাইছে ;
তপ্ত অঙ্গ, চিত্ত ভঙ্গ, পানবারি চাইছে ;
গেল বাস, সর্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাঁদিছে ;
একি দায় ! চোর তায় চৌর্যবৃত্তি সাধিছে ;
বহ্নিজাল পণ্যশাল ঘেরি দেখ লাগিছে ;
মাস, মুগ, তৈল, পূগ, খায় আর রাগিছে ;
গেল ঠাট, পুঁজিপাট, মুদি মুণ্ড কুটিছে ;
হায় হায় ! মৃত্তিকায় দেহপাতি লুটিছে ;
নষ্টদেশ, অর্থশেষ নাহি কার থাকিছে,
ছারখার ভস্মভার দগ্ধধাম ঢাকিছে ;
গ্রামখণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্নিচণ্ড নামিছে ;
দাহিবার নাহি আর ধিকি ধিকি থামিছে .

নিম্নোদ্ধৃত কয় ছত্রে বাত্যার পর প্রকৃতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ।

দেখি গিয়া পরদিন, জনপদ শোভাহীন,
লণ্ডভণ্ড মানব বসতি ;
দুরাচার প্রভঞ্জন দৌরাত্মোর নিদর্শন
গেছে রেখে, শোচনীয় অতি :
কতশত তরুবর মূলসহ কলেবর
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার ;
আর নাহি তুলি কায়া, পথিকেরে দিবে ছায়া,
ফল ফুলে ভুষিবে না আর ।
তাহাদের অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি,
আছে পড়ে এখানে সেখানে :
কত বৃক্ষ কাণ্ড সার, নাহি শাখা অলংকার,
স্থাণু হয়ে আছে স্থানে স্থানে !

নরবাস আলথাল, গৃহ হতে কত চাল
দূরে গিয়া, শুয়েছে ভূতলে ;
অনেক ইটের গেহ ত্যজেছে প্রাচীন দেহ,
অঙ্গহীন হয়েছে সকলে।
পথে চলা কষ্ট অতি, ডালে চালে রোধগতি,
স্থানে স্থানে সেতুর নিপাত ;
বিনষ্ট বাজার হাট, ভেঙেছে দোকান পাট,
হানে মুদী শিরে করাঘাত।
মাঠে ঘাটে, জলে ঝড়ে মরে মরে আছে পড়ে
ধেনু মেষ মহিষ বিস্তর ;
কত নর ভাগ্য দোষে পড়িয়া ঝঞ্ঝার রোষে
গেছে চলে শমনের ঘর।
ভাসে শব নদী নীরে, কত বা লেগেছে তীরে,
কত দ্রব্য স্রোতে ভেসে যায়,
উলটিয়া কত তরী ভাসিছে সলিলোপরি,
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায়।
বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিন্ন ভিন্ন লতা পুঞ্জ,
বিহঙ্গের নাহি কণ্ঠকল,
নর নারী হতজ্ঞান, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ,
ফেলিতেছে নয়নের জল।

আমরা যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, উভয়েই শোধনশূন্য উৎকৃষ্ট বর্ণনার উদাহরণ। গঙ্গাচরণবাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাবকে (Crabbe) মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে বর্ণনাকাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালী সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণবাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভাত বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলকজনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত,
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিশার তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।

মোহিনী মাধুরী করি দরশন
প্রণয় প্রয়াসে আপনি তপন
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে,
অপরূপ রুচি মানস রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে।

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল ;
প্রফুল্ল আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে ;

নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে
কাচসম-স্বচ্ছ সরসীর কোলে
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

আমরা যাহা কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিদাঘ হইতে। এই ঋতুবর্ণনে ছয় ঋতুর বর্ণনা নাই—আপাততঃ বসন্ত এবং নিদাঘই প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বসন্ত হইতে নিদাঘ সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট এবং এতদুভয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। নিদাঘের উৎকর্ষ-হেতু আমরা নিদাঘ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি গঙ্গাচরণবাবু এই ঋতুবর্ণনা সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দবর্ধন করিবেন। আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিব না— না বলিলেও তিনি আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না। তবে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে এবং তাঁহার কবিতা প্রীতিপ্রদ বটে।

পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঋতুবর্ণনের কোনো কোনো অংশ বাদ দিলে ভালো হয়। উদাহরণ— ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি।

অনলেতে চড়াইয়া সেই রস জ্বাল দিয়া
করে কৃষী গুড় অপরূপ।
কিবা মিষ্ট তার তার না হয় তুলনা তার
থাক নর দেবতা লোলুপ॥

গুড় হতে ভারে ভার   হয় চিনি চমৎকার
সুধা সম যার আস্বাদন।
ভোগ সুখ বাড়ে তায়   নানা দেশে লয়ে যায়
বণিকেরা বাণিজ্য কারণ॥
এই যে ভারতবর্ষে   নভো হতে বর্ষে বর্ষে
বর্ষে বারি বারিধরগণ।
সেই জলে যত চাষা   উৎপাদিয়া শস্যরাশি
করে দেশ লক্ষ্মী নিকেতন॥
যত ধনী মহাজন   বাঁধে গোলা অগণন
পূরে তায় খন্দ নানা মত।
প্রতুল ঐশ্বর্য হয়   সতত স্বাধান রয়
কত লোক হয় অনুগত॥

গঙ্গাচরণবাবুর পদ্যের গঠন দেখিয়া বোধ হয়, তিনি রহস্যকাব্যে সফল হইতে পারেন। ঋতুবর্ণনে রহস্যের কোনো উদ্যোগ দেখি নাই— কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে কি হয়, বলা যায় না।

১২৮২ বৈশাখ

পলাশির যুদ্ধ

পলাশির যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশির যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার। এই জন্যই বোধ হয়, মেকলে ক্লাইবের জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।* যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের এক্ষণে কার্য নাই; নবীনবাবুর গ্রন্থের কথা বলি।

প্রথম সর্গে, নবদ্বীপনিবাসী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয়

---

* আমরা এরূপ ব্যঙ্গ করিতে বড় ভয় পাই। সময়ে সময়ে এরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমরা বড় অপ্রতিভ হই। এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য সাহিত্যে, আর্য দর্শনে, আর্য ভাস্কর্যে, বা আর্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম যে, শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্তী! আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক যে সকল পচা পুরাতন চর্বিত চর্বিত পুনশ্চর্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া লেখক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, 'আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!' কি দুঃখ!

এইস্থানে ক্লাইবের জীবনচরিতকে উপন্যাস গ্রন্থ বলিলাম দেখিয়া, এই সকল পাঠকগণ উপরিকথিত প্রথানুসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে কতকগুলি বাঙ্গালা সংবাদপত্র যেরূপ উপন্যাস, এও সেইরূপ উপন্যাস।

পলাশির যুদ্ধ। (কাব্য) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা। নূতন ভারত যন্ত্র। ১২৮১।

প্রধান ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বসিয়া সেরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার পরামর্শ করিতেছেন। এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমত আমাদিগের বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোনো হানি হইত না। ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ সূচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং নবীনবাবুর স্বাভাবিক কবিত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সেরাজউদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন—

"বিরাজিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভায়;—
কামিনী-কোমল-কোল রত্ন-সিংহাসন;
রাজদণ্ড সুরাপাত্র, যাহার প্রভায়
নবাব-নয়নে নিত্য ঘোরে ত্রিভুবন;
সুগোল মৃণালভুজ উত্তরীয় স্থলে
শোভিতেছে অংসোপরে; শুনিছে শ্রবণ
বামাকণ্ঠ-প্রেমালাপ মন্ত্রণার ছলে,
রমণীর সুশীতল রূপের কিরণ
আলোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন;
সংগীতে গাইছে অর্থী মনের বেদন।"

রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে তাঁহারই বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ। তাহা হইতে, হিন্দু যবনে যে সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ক নিম্নোক্ত উপমাটি উদ্ধৃত করিলাম।

নাহি বৃথা জাতি দ্বন্দ্ব ধর্মের কারণে—
অশ্বত্থ পাদপজাত উপবৃক্ষমত
হইয়াছে যবনেরা প্রায় পরিণত॥

ষড়যন্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের সাহায্যে অত্যাচারী সেরাজউদ্দৌলাকে দূর করিতে হইবে— সেরাজের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী। ইংরেজের সাহায্য যাহা হইবে, তাহা দৈব বাণীর

ন্যায় কথাপরম্পরায় রাণী বুঝাইয়া দিলেন, পরে নিজমত এইরূপ প্রকাশ করিলেন—

"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !—
অসহ্য দাসত্ব যদি ; নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে,
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে,
হাসুক উজলি বঙ্গ ;—এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী
বহিছে বিদ্যুৎবেগে আমার ধমণী ।

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর ।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে ;
সহি কিসে মাতৃদুঃখ ? সত্য সেঠবর !—
বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থ সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন,
হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার,
জঘন্য দাসত্ব-পন্থে কর বিচরণ ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার !!"

বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শমত কার্য হইল না। এইখানে প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরম্ভ। এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হইতে এই কাব্যে, কবিত্বকুসুম এরূপ প্রভূত পরিমাণে বিকীর্ণ হইয়াছে যে, কোন্ স্থান উদ্ধৃত

করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরতা পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি। এইরূপ অপর্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ দুর্লভ রত্নসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন।

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈন্যের নদী পার হওয়ার চিত্র, তপন-চিত্রিত ফটোগ্রাফতুল্য—এবং ফটোগ্রাফে যে অদ্ভুত রশ্মি নাই—ইহাতে তাহা আছে। অপরাহ্ণ হইয়াছে—

খচিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিণী,
চুম্বি মৃদু কলকলে, মন্দ সমীরণ,—
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিণী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

অদূরে কাটোয়া দুর্গে ব্রিটিস-কেতন,
উড়িছে গৌরবে উপহাসিয়া ভাস্করে।
উঠিতেছে ধূমপুঞ্জ আঁধারি গগন,
ভস্মিয়া যবন-বীর্য কাটোয়া-সমরে।
সশস্ত্র বৃটিস সৈন্য তরী আরোহিয়া
হইতেছে গঙ্গাপার, অস্ত্র ঝলমলে ;
দূর হতে বোধ হয়, যাইছে ভাসিয়া
জবা-কুসুমের মালা জাহ্নবীর জলে ;
রক্তবস্ত্রে, রণ-অস্ত্রে, রবির কিরণ
বিকাশিছে-প্রতিবিম্ব, ধাঁধিয়া নয়ন

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চালন
তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝনন্ ঝনন,
হ্রেষিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, গর্জিছে বারণ।

থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য ভুজঙ্গ যেমতি
সাপুড়িয়া মন্ত্রবলে ;—কভু অস্ত্র করে,
কভু স্কন্ধে ; ধীরপদ ; কভু দ্রুতগতি।
'ড্রমের' ঝর্ঝর রব 'বিপুল' ঝংকার
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিসের বীর অহংকার।

সৈনিকদিগের কেবল বাহ্য দৃশ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাইব তরুতলে বসিয়া, কর্তব্যাকর্তব্যচিন্তিত। ভাবী ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকতা পর্যালোচনা করিয়া তিনি শঙ্কিত। এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন। সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির সৃষ্টি ; রাজলক্ষ্মীকে কবি এক অপূর্ব মহিমাময় শোভায় পরিমণ্ডিত করিয়াছেন।

কোটি কোহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন, সেই বরাননে ;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক-অলকাবলা—বিমুক্ত কুঞ্চিত,
অপূর্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ,
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্মালায় খচিত
জ্যোতি রত্নে অলংকৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চির-প্রজ্বলিত।

উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ চন্দ্রিমা,
যেমন প্রখরতেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃত মাখা পূর্ণমধুরিমা।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,।
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্তি দেখিলা নয়নে।

তাঁহার বাক্যগুলি আকাশপ্রসূত মেঘধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

রাজার উপরে রাজা, রাজরাজেশ্বর ;
জেতার উপরে জেতা জিতের সহায়,
আছেন উপরে বৎস ! অতি ভয়ংকর !
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূর্তিমান্ ন্যায়,
তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে,
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্ধনে,
সমভাবে সর্বদেশে শ্বেতে ও শ্যামলে
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।
পার্থিব উন্নতি নহে, পরীক্ষা কেবল
সম্মুখে ভীষণ, বৎস ! গণনার স্থল।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিত্ব প্রকাশ। নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র চিত্রটি দেখ—

সজ্জিত তরণী ছিল তীরে দাঁড়াইয়া,
লম্ফ দিয়া যেই বীর তরী আরোহিল ;
স্থির ভাগীরথী জল করি উচ্ছ্বসিত,
অমনি ব্রিটিস বাদ্য বাজিয়া উঠিল ;
ছুটিল তরণী বেগে বারি বিদারিয়া,

তালে তালে দাঁড়ী দাঁড়ে পড়িতে লাগিল ;
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাঁপিয়া,
সুনীল আরশিখানি ভাঙিল গড়িল ;
একতানে বীরকণ্ঠ ব্রিটিস-তনয়
গায় "জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়—"

ঐ তরণীর নাবিকদিগের গীত অতি মনোহর—বাইরনের যোগ্য। গীতটি শুনিয়া বাইরনকৃত নাবিকদস্যুর গীত মনে পড়ে।*

সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটননন্দন ;
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিংবা আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্যশালিনী পূরব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমদয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয়।"

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার,
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈষা ত্রাণকারী।
বজ্রাগ্নি জিনিয়া আমাদের গতি,
দাবানলসম বিক্রম বিস্তার ;
আছে কোন্ দুর্গ ? কোন্ অদ্রিপতি ?
কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ?
শুনিয়া সভয়ে কম্পিত না হয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ?"

* *The Corsair.*

আকাশের তলে এমন কি আছে,
ডরে যারে বীর ব্রিটিসতনয় ?
কেবল ব্রিটিসললনার কাছে,
সে বীরহৃদয় মানে পরাজয় ;
বীর বনোদিনী সেই বামাগণে,
স্মরিয়া অন্তরে ; চল রণে তব ;
হায় ! কিবা সুখ উপজিবে মনে,
শুনে রণবার্তা বামাগণে যবে;
গাবে বামাকণ্ঠ-স্বর করি লয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ।"

অতএব সবে অভয় অন্তরে,
চীত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান,
ব্রিটনিয়াপুত্র রণে নাই ডরে,
খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ;
ব্রিটিসের নামে ফিরে সিন্ধুগতি,
বিক্ষিপ্ত অশনি অর্ধপথে রয় ;
কি ছার দুর্বল যবনভূপতি,
অবশ্য সমরে হবে পরাজয় ;
গাবে বঙ্গসিন্ধু, গাবে হিমালয়,
"জয় জয় জয় ব্রিটিসের জয় ।"

তৃতীয় সর্গের আরম্ভে সেরাজউদ্দৌলার শিবিরে নৃত্য গীতের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এমত সময়ে, সহসা ইংরেজের বজ্র গর্জিয়া উঠিল। পুনশ্চ, বাইরন কৃত ওয়াটালুর যুদ্ধের পূর্বরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ে।

"There was a sound of revelry by night" &c.

নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাইরনের যোগ্য।

বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্রনীলোৎপল
বাসনা-সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !

তোপের শব্দে নৃত্য গীত ভাঙ্গিয়া গেল—সেরাজউদ্দৌলা ভবিতব্য চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার উক্তিগুলিতে, তাঁহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্বল, ভীতচিত্ত, অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই কাব্যে কবি চরিত্রের আশ্লেষণ* শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন নাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণ† শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন।

নবাব, আপনার কর্মফল ও চরিত্রদোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমূঢ় হইয়া, মীরজাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন, কিন্তু ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার একজন স্নেহময়ী মহিষী তাঁহাকে তুলিয়া অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এদিকে, এক ব্রিটিস যুবক—

প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার !

ইত্যাদ্য এক সুমধুর গীতিধ্বনি বিকীর্ণ করিতে লাগিল— এইরূপে রজনী প্রভাতা হইল। তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল।

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য অতি অল্প ; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এই মাত্র ;

* Synthesis.
† Analysis.

দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল, এই মাত্র ; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া এ সকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধবর্ণনা অতি সুন্দর।

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে ;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল সঘনে।

আবার আবার সেই কামান গর্জন।
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

আবার আবার সেই কামান গর্জন।
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা ·

খেলিছে বিদ্যুৎ এক ধাঁধিয়া নয়ন !
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন ।

ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মিরমদন পতন !

"হুর্‌রো, হুর্‌রো" করি গর্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ ।

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জিল মোহনলাল "নিকট শমন ?"

তৎপরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। ...ত্য ইতিহাসে ইহা কীর্তিত আছে যে, হিন্দু সেনাপতি মোহনলাল ...লাশির ক্ষেত্রে ক্লাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি ...ীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তবে ভারত সাম্রাজ্য অদ্য কে

ভোগ করিত তাহা বলা যায় না। যবনসেনা পলায়নোদ্যত দেখিয়া মোহনলাল তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে বসিয়া আপনি পাঠ করিবেন।

তাঁহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল, আবার রণ হইতে লাগিল— কিন্তু এমত সময়ে শঠ মীরজাফরের পরামর্শে নবাব রণস্থগিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। নবাবের সৈন্য তখন রণে নিবৃত্ত হইল। তাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বিগুণ বল করিল।

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন,
ইংরাজ সঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন।

কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারও গলায়
লাগিল; সঙ্গিন ঘায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিস বাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

মূর্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেল রবি, হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

ইংলণ্ডের রণজয় হইল— সূর্যাস্ত হইল— কবি সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজমনের কথা কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে। চাইল্ড হেরল্ডে বাইরন সচারাচর এইরূপ মন্তব্য পদ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চাইল্ড হেরল্ড বর্ণন কাব্য, আর পলাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য। যাহা চাইল্ড হেরল্ডে সাজে, পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না। এই কাব্যে কার্যের গতিরোধ করা কর্তব্য হয় নাই। কিন্তু এ কাব্যের কার্য অতি মন্দগামী, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, সেরাজউদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।

মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর, রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য-কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয়নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটন করা কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীনবাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প— গীতি অতি

প্রবল। নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোনো শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরনের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাবসকল আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বাইরন স্বয়ং একস্থানে কোনো নায়কের বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

* * *

But mine was like the lava flood
That boils in Etna's breast of flame.
I cannot prate in puling strain
Of ladye-love and beauty's chain :
If changing cheek and scorching vein,
Lips taught to writhe but not complain,
If bursting heart, and madd'ning brain,
And daring deed and vengeful steel,
And all that I have felt and feel,
Betoken love, that love was mine,
And shown by many a bitter sign.*

The Giaour.

নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্যস্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়— তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।

বাইরনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরনের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব। পলাশির যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালী জন্ম বৃথা।

১২৮২ কার্তিক

মিলপ্রদত্ত শিক্ষা

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, প্রথম প্রস্তাবে [১] আমরা বুঝাইয়াছিলাম যে, আমাদের মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক্ অনুশীলন ও সংস্করণই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল— সুতরাং মিলের জীবনচরিত মানুষের অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত এবং তল্লাভের পথ নির্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ করিলে এই নবাবিষ্কৃত চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। কিন্তু আমার তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। ভরসা করি, কোনো অধিকতর ক্ষমতাশালী লেখক এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি এক্ষণে কেবল যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক ও লেখক, উভয়ের তুষ্টিবিধান করিব।

প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি মনোবৃত্তিগুলি বিবিধ— জ্ঞানার্জিনী এবং কার্যকারিণী। উভয়েরই সম্যক্ অনুশীলনে ও স্ফুর্তিপ্রাপণে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যলোকে এমত অনেক দর্শন বা ধর্মশাস্ত্রের সমুদ্ভব হইয়াছে যে সে সকল এই সুমহত্তত্ত্বের কাছে গিয়া দিশাহারা হইয়াছে। কেহ কেহ অর্ধেক পাইয়াছে— অর্ধেক পায় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিয়া কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন— এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুষ্যত্বসাধক হয়

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ প্রণীত। যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনিঙ লাইব্রেরি। ১৮৭৭।

[১] 'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা/প্রথম ভাগ—মনুষ্যত্ব কি?', বঙ্গদর্শন, ১২৮৪ আশ্বিন। দ্রষ্টব্য 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ'। দ্বিতীয় প্রস্তাব 'মিলপ্রদত্ত শিক্ষা' অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত।

নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্ম কেবল কার্যকারিণী বৃত্তিগুলিকে মনুষ্যত্বের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জিনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্মও মনুষ্যত্বসাধক হইতে পারে না।

আমরা সর্বপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলনের কথা বলিব। সেই অনুশীলনের দুইটি উদ্দেশ্য ও ফল— প্রথম জ্ঞানের অর্জন, দ্বিতীয় বৃত্তিগুলির পরিপোষণ ও শক্তিবৃদ্ধি। বিদ্যালয়াদিতে যে শিক্ষা হয়, সচরাচর তাহাতে কেবল জ্ঞানার্জনই হইয়া থাকে। বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার তাদৃশ উদ্দেশ্য নহে। জন মিলের পিতা জেম্‌স্‌ মিল সেইজন্য পুত্রকে কোনো বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ জেম্‌স্‌ মিল স্বয়ং জ্ঞানী, মার্জিতবুদ্ধি, চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য পুত্র, তাঁহার শিক্ষায় অতি অল্পবয়সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মিলের অকালপাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজি কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের অনুরোধ— যাঁহারা সে বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা তদ্বৃত্তান্ত মিলের জীবনবৃত্ত হইতে অধীত করেন। দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। চতুর্দশ বৎসর বয়সে মিল গুরুদত্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিব। মিল বলেন, "পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত, এবং আমার প্রকৃতি

স্বভাবতঃ কার্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখনো উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে— আমি যাহা করিয়াছি— তাহা করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যদি আমার দ্বারা কোনো অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে— তাহা আমার গুণে নহে— পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল— পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন— তাহারই ফল।

শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনা না হইয়া বরং ম্লানভাব ধারণ করে। নিজের মত ও নিজের চিন্তার পরিবর্তে— পরের মত ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ স্মরণশক্তির সম্মার্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকাল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

আত্ম-গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য সহচর। ইহার সাহচর্যে অনেকের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষসূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোনো উচ্চভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদুর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখনো জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোনো বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোনো বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি আমা অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখনো আমার মনে হইত না যে আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত যে কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধকবশতঃই সেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখনো বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখনো উদ্ধতও ছিল না। আমি কখনো চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখনো উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখনো নীচ বলিয়াও ভাবি নাই— অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছু ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখনো আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এইমাত্র যে— আমি পাঠনা দ্বারা কখনো পিতার সন্তোষ জন্মাইতে

পারিলাম না— সুতরাং আমি পড়াশুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম।”

তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা। গুরুদত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র— আত্মশিক্ষাই সকল মনুষ্যের শিক্ষার প্রধান ভাগ— কাণ্ড ও শাখা-পল্লব। মিলের সেই আত্মশিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া অবগত হইতে হইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত সংসর্গের ফল। আমরা যাহাদিগের সর্বদা সহবাস করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বারা আমরা সর্বদা আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্তিত হই। মিলের জীবনীতে তাঁহার বন্ধুবর্গের সংসর্গের ফল অতি সুস্পষ্ট— জেম্‌স্ মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্‌থাম, অষ্টিনদ্বয়, রোবক কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা, তাহার অধ্যয়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্বোপরি যিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে পত্নী, সেই অদ্বিতীয় রমণীপ্রদত্ত শিক্ষা অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অতিশয় মনোহর। আমার ইচ্ছা করে এইটুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহিণীগণের হস্তে সমর্পিত হয়— তাঁহারা দেখুন কেবল সীতা এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়া কর্তব্য নহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ আছে। যে রমণী পতিপরায়ণা সে ভাল— কিন্তু যে পতির মানসিক উন্নতির কারণ সে আরও ভাল।

জ্ঞানার্জিনী বৃত্তিগুলির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনের কথা সম্বন্ধে মিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আধার। জ্ঞানার্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সেই অসম্পূর্ণতা হেতু মিলের ন্যায় মার্জিতবুদ্ধি মহদাশয় পণ্ডিতের যে মানসিক সংকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাদৃশ অধ্যয়নীয় তত্ত্ব আর কিছুই দেখি না।

বৃত্তিগুলির কার্যকারিণী বৃত্তি নাম দিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। যাহাকে ইংরেজেরা 'Active faculties' বলেন, অনেকে কার্যকারিণী অর্থে তাহাই বুঝিবেন। তাহাতে সকলটুকু বুঝায় না। এইজন্য অনেকে এইগুলিকে ধর্মপ্রবৃত্তি বলেন। অন্তর্জগতের সঙ্গে বৃত্তিগুলির যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিতে গেলে ধর্মপ্রবৃত্তি নাম মন্দ হয় না। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে উহাদের যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ করিলে মনোবৃত্তিগুলি বিভাগ করিয়া জ্ঞানার্জিনী এবং কার্যকারিণী এই দুই নাম দিতে হয়। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন্ বৃত্তিগুলির কথা বলিতেছি। যোগেন্দ্রবাবুর পুস্তকে এই সকল 'কোমলতর' বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে— নামটি বিশেষ দূষণীয়। বৃত্তিগুলি সুখদায়িনী বলিয়া কোমল নাম পাইয়াছে— নহিলে উহাদিগের আর কিছু কোমলতা নাই।

মিল নীতিশাস্ত্রে অশিক্ষিত হয়েন নাই। তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান নীতিবেত্তা এবং তাঁহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ কার্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু নীতিজ্ঞানের উপার্জন কার্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন নহে— সেও জ্ঞানার্জিনী বৃত্তির অনুশীলন মাত্র। 'পিতামাতাকে ভক্তি করিও' এই নৈতিক তত্ত্ব যে শিখিয়াছে সে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে অতটুকু জ্ঞান উপার্জিত করিয়াছে। যে সেই নৈতিক সূত্রকে কার্যে পরিণত করিয়া পিতামাতাকে ভক্তি করে, সে একটি পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু সে মানসিক বৃত্তির অনুশীলন কিছুই করে নাই। কার্যের অভ্যাস এবং কার্যকারিণী বৃত্তির পরিমার্জন স্বতন্ত্র।

কার্যকারিণী বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনের একটি শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদির অনুশীলন। যদি মনের এই ভাগের পরিপুষ্টি শিক্ষার মধ্যে ন্যস্ত করিতে হয়, তবে শিক্ষার মধ্যে কাব্যের একটি প্রধান স্থান পাওয়া আবশ্যক। মিলের শিক্ষা মধ্যে কাব্য স্থান পায়

নাই। জেম্‌স্ মিল কবিত্ব বুঝিতেন না— কাব্যকে ঘৃণা করিতেন। যে সম্প্রদায়ের ইংরেজের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীগণ কাব্যকে 'লঘুসাহিত্য' বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন জেম্‌স্ মিল সেই সম্প্রদায়ের ইংরেজ ছিলেন— অর্দ্ধমাত্রার মনুষ্য। সুতরাং জন মিল সেই শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শিক্ষার সেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধন চিন্তাশীল এবং উৎকর্ষাভিলাষী জন ষ্টুয়ার্ট মিলের ঘোরতর মানসিক সংকট উপস্থিত হইল। বাঙ্গালা সংবাদপত্র লেখকের সেরূপ সংকটের অতি অল্প সম্ভাবনা কিন্তু মিলের ন্যায় মনুষ্যের তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই বৃত্তান্ত আমরা যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ হইতে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ব ও পরিণত হইয়া উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসর কালে তাঁহার চিন্তাসকল বাহ্য জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল বেন্থামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতের মঙ্গলসাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ— এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। * একদিন অকস্মাৎ

তাঁহার হৃদয়াকাশে একখান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখ-সূর্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, 'মনে করো তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?' সহসা অনিবার্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল 'না!' এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্মিত হইতেছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,— তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্যসংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরী কর্ণধার শূন্য হইল। মিল ভাবিলেন এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ববৎ জর্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্যে যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভন পরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূঢ় গভীর বেদনাকে বিস্মৃতি-জলে ভাসাইতে পারিল না। এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তকরাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে আর পূর্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একবারে পর্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি

জানিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোনো নিবার্য বিপদ পড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এরূপ অনিবার্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তাঁহার রোগ একপ্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃচিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

মিল যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে কোনো বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোনো বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোনো বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে সুখ এবং কোনো বিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে এই এই কার্য করিলে আমরা সুখী

এবং এই এই কার্য করিলে আমরা অসুখী হইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্যের সহিত সুখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তু ও কার্যের সহিত সুখ দুঃখের এরূপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেম্‌স্‌ মিল সর্বদা বলিতেন যে, যে কার্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ এবং যে বস্তু ও কার্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তাহার সহিত দুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সম্বন্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য। মিল পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেম্‌স্‌— প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্বপরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে এইরূপ বলপূর্বক কোনো সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখনো নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটিই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক; সুতরাং মনুষ্যের কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্তু ও কার্যের সহিত সুখ ও দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনা-বিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসম্বন্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য অস্বাভাবিক ও

কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত করো, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি সে সকল গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি-সকল তদীয় বিশ্লেষণশক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৬—২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। পাঠনা তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোনো সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বেই অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্ফূর্তি ব্যতীত, মিলের কার্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার

নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল 'যখন জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি ইহা কতকাল বহন করিতে পারিব?' তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল 'তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।' কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক বৎসর কাল অতীত না হইতেই আশাসূর্যের একটি সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। একদিন তিনি মার্মনটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে— বাল্যাবস্থায় মার্মনটেলের পিতৃবিয়োগ, এবং পিতৃবিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপ শ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্মনটেলের হৃদয়ের বিগলিত ভাব ও তৎকর্তৃক পরিবারবর্গের সান্ত্বনা— এই সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছিল সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। বিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য ও অনিবার্য নহে— যে মুহূর্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য-কিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন

ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তামেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েকবার তাঁহার অন্তর এই চিন্তামেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ের ন্যায় জীবনের আর কোনো ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

এই সকল ঘটনায় মিলের মতে দুইটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বে এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানবজীবনের সমস্ত কার্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্তমান মতে আত্মসুখ— কার্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ করো, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে, পরের সুখ বর্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাকো, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখ বিমোচন ও পরের সুখবর্ধন তোমার গন্তব্য স্থান হউক; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখনো আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখনো অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ সুখ,— ব্যগ্রতা ও অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্ম-বহির্ভূত কোনো বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ হইল। মিলের মতবিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা এই;—

এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনারই বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে; উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সংগীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল বাল্যাবধিই সংগীতপ্রিয় ছিলেন; সংগীতের মোহিনীশক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন সংগীত অন্তরে কোনো নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরন পাঠ করেন। মিল স্বয়ং যে দুঃখপ্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরনের চাইলড্ হেরল্ড ও ম্যানফ্রেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাইরন পাঠে তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাব-বর্ণনা বিশেষরূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাববর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; স্বভাবসৌন্দর্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্বপ্রথমে জানিতে

পারিলেন যে প্রকৃতি পর্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন। এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।”

আমরা এইখানে মিলের কথা সমাপন করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন। সেই গ্রন্থের গুণ দোষ সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলিব— উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহার পর আধিক্য নিষ্প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্লভ শিক্ষার স্থল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অতি বিরল। তার পর, তাহার সংকলন ও গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবনচরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেন্দ্রবাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটি আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি। এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।

১২৮৪ পৌষ

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয়

লক্ষ্মণাবতী

যাহা এক্ষণে বাঙ্গালা দেশ বলিয়া পরিচিত, মুসলমানেরা আসিবার আগে, তাহা কতকগুলি ক্ষুদ্রতর রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার মধ্যে একটি রাজ্য। এইরূপ আর কয়েকটি রাজ্য ছিল। উত্তর বাঙ্গালায় কামরূপ বা রঙ্গপুরের রাজাদিগের অধিকার ছিল। পশ্চিমে, যাহা এক্ষণকার মানভূম ও বাঁকুড়া প্রদেশ, তাহা পঞ্চকোটি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণকার মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ; বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশেও তাঁহাদিগের অধিকার ছিল বোধ হয়। আধুনিক মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার অধিকাংশ উড়িষ্যাধিপতির অধীন ছিল। ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গাবংশীয়দিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাঁহারা ইংরেজের অধীনস্থ হইতে ঘৃণা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পূর্ব পুরুষ দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িয়ার অধীন ছিলেন। দক্ষিণে বরিশাল জেলা ও যশোহরের পূর্বাংশ, চন্দ্রদ্বীপের রাজার রাজ্যান্তরর্গত। তৎপূর্বে ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত। চট্টগ্রামে 'মগের মুলুক।'

এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। তথাপি গৌড়ের কিছু প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্যের একটা কারণ, গৌড়রাজ্য সকলের মধ্যবর্তী; এবং লক্ষ্মণ সেন ও বল্লাল সেন প্রভৃতি প্রবল-প্রতাপ রাজগণের রাজ্যকালে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ সেন ও বল্লাল সেনের সময়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়েশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, এমতও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। মিথিলা ইহাদের

করতলস্থ ছিল— বারাণসী পর্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু শেষ দশায় এ গৌরবের কিছুই ছিল না। তবে সে গৌরবের স্মৃতি ছিল— পূর্ব সৌষ্ঠবের ভগ্নাংশ ছিল। আর ইহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই রাজ্য মধ্য-দেশের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া, মগধ কান্যকুব্জাদি মধ্যদেশী সুসভ্য সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সহিত ইহার অধিকতর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এইখানেই আর্যজাতীয়-দিগের অধিকতর ভরাভর ছিল। কাজেই বিদ্যালোচনা, বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্যতার উপাদান সকল বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা লক্ষ্মণাবতীতে অধিকতর প্রচুর ছিল।

এই গৌড়রাজ্যও সেনরাজাদের শেষাবস্থায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক ভাগের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী ; কেবল মধ্য বাঙ্গালা, অর্থাৎ এখন যাহা মালদহ, মুরশীদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত, তাহাই লক্ষ্মণাবতী-পতির অধিকৃত ছিল। আর পূর্বাঞ্চল, অর্থাৎ বঙ্গদেশ, সুবর্ণগ্রামের অধিকারভুক্ত ছিল। সেখানেও সেনরাজা রাজ্য করিতেন।

অতএব এক কালে গৌড়রাজ্য যত বড়ই থাকুক না কেন, বখ্-তিয়ার খিলিজির সময়ে তাহা অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রাচীন গৌরবে বড়, নহিলে আর বড় কিছুতেই নহে। এখন সেই রাজ্য একজন অশীতিপর বৃদ্ধ অক্ষম শাসনকর্তার হস্তে, মুসলমানের জন্য সুপক্ক ফলের ন্যায় ঝুলিতেছিল।

এই সকল রাজ্যগুলিকে আর্যভূমি বলা একটু অত্যুক্তি। আজিও বাঙ্গালা আর্যভূমি নহে। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক অনার্যবংশ সম্ভূত। ভারতবর্ষের অন্যত্র যাহা হইয়াছে বাঙ্গালাতেও তাহা হইয়াছে। ভারতের সর্বত্রই সমাজের উচ্চস্তর সকল আর্যবংশীয়, সমাজের নিম্নস্তর সকল অনার্যবংশীয়। কোথাও কম, কোথাও বেশি। কোথাও অনার্যেরা আর্যসমাজভুক্ত হইয়াছে, আর্য ধর্ম গ্রহণ

করিয়াছে, কিন্তু আর্য ভাষা গ্রহণ করে নাই। দাক্ষিণাবর্তে ঐরূপ। কোথাও ঐ অনার্যগণ আর্যদিগের বশীভূত হইয়া, আর্যপ্রভুদিগের সমাজভুক্ত হইয়া, আর্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, আর্যভাষাও গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় সেইরূপ। আর্যেরা বাঙ্গালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী আর্য নহে।

যদি এখন এই অবস্থা, তবে সেন রাজ্যের শেষাবস্থাতেও এইরূপ ছিল বিবেচনা করিতে হইবে। বরং এখন, কালসহকারে জাতীয় সম্মিলন পূর্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়াছে। তখন আর্যে ও অনার্যে পার্থক্য আরও স্পষ্ট ছিল, ইহাই অনুমেয়। বাঙ্গালার পূর্ববৃত্তান্ত ঘোরান্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে, ক্ষীণালোকে দেখিতে পাই, নানাজাতি চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঠেলাঠেলি করিতেছে। আগে কোলবংশ। অন্ধকারে সর্বপ্রথমে তাহাদের কৃষ্ণকায় দেশব্যাপক দেখা যায়। তারপর, দ্রাবিড়ী অনার্যেরা আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিম হইতে তাহাদিগকে ঠেলিতেছে। তারপর আর্যদিগের আবির্ভাব। বাঙ্গালায় আর্যেরা কখন আসেন, তাহার নিরূপণ অতি কঠিন। যখনই আসুন, আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় আর্যের সংখ্যা অল্প ছিল সন্দেহ নাই। এখনকার বাঙ্গালী আর্যদিগের মধ্যে সংখ্যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থই অধিক ; এই ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে অল্পাংশ ভিন্ন সকলের পূর্বপুরুষেরা আদিশূরের সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন। অতএব আদিশূরের পূর্বে বাঙ্গালায় আর্যসংখ্যা অল্প ছিল। ঐতিহাসিক প্রভাতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম সাম্যময় ; এই বৌদ্ধধর্ম কর্তৃক বাঙ্গালার অনার্যগণ প্রথমে আর্যসমাজভুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রবল থাকিলে কি হইত বলা যায় না ; কিন্তু পালবংশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত হইল। সেনরাজারা পৌরাণিকধর্ম স্থাপিত করিলেন। পৌরাণিকধর্ম বৈষম্যময়

—ইহার হাতে সমাজকর্তৃত্ব ন্যস্ত হইলে সমীকরণ কার্য আর তত নির্বিঘ্ন রহিল না। জনসমূহমধ্যে একজাতীয়ত্ব জন্মিল না। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মুসলমান আসিলেই, সেই সমাজের একভাগ —অর্ধেক ভাগ বলিলেও বলা যায়— মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করিল। বিজিতের সমাজ ত্যাগ করিয়া জেতৃগণের সমাজে গেল। জাতীয় বন্ধন ছিল না।

অতএব দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালায় আসিল, তখন বাঙ্গালা একেবারে বন্ধনশূন্য। কতকগুলি অনতিবৃহৎ রাজ্য— রাজ্যে রাজ্যে কোনো বন্ধন নাই। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতি— জাতিতে জাতিতে কোনো অচ্ছেদনীয় বন্ধন নাই। যাহা ছিল, তাহাও ভিতরে ঘুনেধরা। এই ভিন্ন ভিন্ন অনতিবৃহৎ রাজ্যগণের মধ্যে কোনটিও একতাসম্পন্ন নহে— কোনটি আধুনিক ইউরোপীয় রাজ্যের মত নিরেট গড়নের নয়। এই সকল রাজ্যের ভিতর আবার করদ রাজারা ছিলেন। বৃহত্তর রাজ্যের রাজা তাঁহাদের উপর সার্বভৌম ছিলেন। মধ্যকালের ইউরোপে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বার্গণ্ডি বা নর্মাণ্ডির অধিপতির যে সম্বন্ধ ছিল; অর্থাৎ সুজারাইনের* সঙ্গে বাসালের† যে সম্বন্ধ, সার্বভৌমের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রাজাদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল; ইহারা সার্বভৌমকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতেন, সার্বভৌমকে কদাচিৎ কর দিতেন, যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাইতেন। তারপর তাঁহারাই রাজা— তাঁহারাই প্রজাপালক— দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, রাজভাগের অধিকারী। এরূপ সর্বভৌমের বাহু বড় দুর্বল। অধীনস্থ রাজগণের সাহায্য সকল সময়ে পাওয়া যায় না। কখনো তাহারা জুটিতে পারিল না— কখনো অনিচ্ছুক— কখনও শত্রুপক্ষ। এইরূপ অধীনস্থ রাজগণকে কাবু করিয়াই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসকল

* Suzerain.

† Vassal.

বলবিশিষ্ট হইতে পারিয়াছে। গৌড়ে তাহা হয় নাই— গৌড়েশ্বর সার্বভৌম অনায়াসপরাজিত হইলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজগণ হইতে একটা বিশেষ সুফল জন্মিল। সার্বভৌম পরাজিত হইলেন বটে— মুসলমান তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইল, কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজারা বজায় রহিলেন। তাঁহারা যেমন সেনরাজাকে মানিতেন, মুসলমান সুলতানকেও সেইরূপ মানিতে লাগিলেন— কিন্তু প্রকৃত রাজশাসন তাঁহাদেরই হাতে রহিল। যে অর্থে এখন বাঙ্গালা পরাধীন, পাঠানদিগের সময় সে অর্থে পরাধীন হইল না। আকবর শাহের সময়েও ইঁহারা এমন প্রবল ছিলেন যে, তাঁহারা প্রয়োজনমতে অতি বিশাল অশ্বারোহী ও পদাতি যুদ্ধপোত বাহির করিতে পারিতেন। এখনও ইঁহাদের উচ্ছেদ হয় নাই— তবে ইংরেজের আমলে ইঁহারা জমিদার মাত্র— আর কোনো শক্তি নাই।

মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা জয় সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা 'তাবকাত নাছিরি' নামক প্যারস্য গ্রন্থ হইতে। ঐ গ্রন্থের প্রণেতা আবু ওমর মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন জর্জাতি— অথবা সংক্ষেপতঃ মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন। তিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারার্থ এই।—

"৫৯৯ হেজিরা-অব্দে (ইং ১২০২।৩) মুসলমানেরা বেহার জয় করিয়াছে এবং বাঙ্গালার সীমায় আসিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদেরা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে, পুরাণে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তুর্কিয়েরা বাঙ্গালা জয় করিবে। অতএব মহারাজ, নিজ ধন-সম্পত্তি, পৌরজন ও রাজধানী নবদ্বীপ হইতে এমন কোনো নির্বিঘ্ন ও দূরবর্তী প্রদেশে লইয়া যান যে, সেখানে এই বৈরীবর্গের আক্রমণের কোনো শঙ্কা না থাকে।

এই কথা শুনিয়া, রাজা ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে

পুরুষ বাঙ্গালা জয় করিবে, পুরাণে তাহার কোনো বর্ণনা আছে কি না। ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিল— হাঁ আছে ; আর সে বর্ণন, বেহারে যে মুসলমান সেনাপতি নিযুক্ত আছে, তাহারই অনুরূপী।

রাজা তখন অতিশয় বৃদ্ধ এবং নবদ্বীপের পক্ষবাদী তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না এবং বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার কোনো উপায়ও করিলেন না। কিন্তু অমাত্যবর্গ এবং যত প্রধান ব্যক্তি, সকলেই আপন আপন পৌরজন ও ধনসম্পত্তি 'জগন্নাথ প্রদেশে' (উড়িষ্যায়) অথবা গঙ্গার পূর্বোত্তর পারস্থিত প্রদেশে পাঠাইয়া দিল।

৬০০ হেজিরা অব্দে, (ইং ১২০৩।৪) মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালার অরক্ষিত অবস্থার বিশেষ সংবাদ পাইয়া গোপনে সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। বেহার হইতে তিনি এমন সত্বর নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন যে, তাঁহার আগমন কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

নগরের নিকটে আসিয়া তিনি এক বনমধ্যে সৈন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়া সপ্তদশমাত্র অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষিবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে তাঁহারা রাজদূত ; নবদ্বীপাধিপতিকে প্রণাম করিতে যাইবেন। রক্ষিবর্গ তাঁহাদিগকে পুরী প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। পুরী প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা অসি নিষ্কাষিতপূর্বক রাজানুচরবর্গকে বধ করিতে লাগিল।

রাজা লাছমনীয়া* তখন ভোজনে বসিয়াছিলেন। তিনি পৌরবর্গের আর্তনাদ শুনিয়া, খড়কীদ্বার দিয়া, পুরী হইতে পলায়ন করিলেন। একখানা ডিঙ্গীতে চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে নদী বাহিয়া গেলেন।

* বোধ হয়, ইঁহারও নাম লক্ষ্মণসেন ছিল।

মুসলমান সেনার অবশিষ্ট ভাগ এক্ষণে আসিল। তাহারা কতকগুলি হিন্দুকে প্রাণে বধ করিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিল। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ; এবং অবশিষ্ট জীবন ধর্মানুশীলনে নিয়োগ করা স্থির করিয়া জগন্নাথে চলিয়া গেলেন। পরে শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে মৃত্যুলাভ করিয়াছিলেন।

রাজার পলায়নের পর বখ্‌তিয়ার সৈন্যের দ্বারা নগর লুঠ করাইলেন— আপনি কেবল হস্তীগুলি এবং রাজভাণ্ডারস্থ দ্রব্য জাত রাখিলেন। তাহার পর তিনি নির্বিবাদে লক্ষ্মণাবতী গমন করিলেন।”

এই সকল কথার কিছু পরে লেখা আছে যে বখ্‌তিয়ার এক বৎসরে বাঙ্গালা জয় সম্পন্ন করিলেন।

এই বৃত্তান্ত কতদুর সমূলক, তাহার বিচার পশ্চাৎ করিতেছি। কিন্তু সমুলক হউক আর অমূলক হউক, এই লেখার উপর নির্ভর করিয়া স্থূলবুদ্ধি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তৃগণ রটাইয়াছেন যে, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। অল্প বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রথমতঃ, সপ্তদশ অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা মিনৃহাজ্‌উদ্দীন কোথায় লিখিয়াছেন ? উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে কেবল ইহাই লেখা আছে যে, সপ্তদশ অশ্বারোহী মিথ্যা ছল করিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিয়াছিল। ছিঁচ্‌কে চোরে সচরাচর এরূপ ছল করিয়া সকলেরই পুরী প্রবেশ করিয়া থাকে— তাহাদিগকে কেহ রাজ্যবিজেতা বলে না। এই সতের জন জুয়াচোর রাজপুরী অধিকার করিতে পারে নাই— তাহা মিনৃহাজ্‌উদ্দীনের কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে। কেন না, মিনৃহাজ্‌উদ্দীন লিখিতেছেন যে, অবশিষ্ট মুসলমান সেনা তৎপশ্চাৎ আসিয়া নগর ও পুরী অধিকার করিয়াছিল। অতএব রাজ্য জয় দূরে থাক্‌, নগর জয় দূরে থাক্‌,

রাজপুরীখানিও সেই সপ্তদশ চৌরে জয় করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ রাজা পলাইয়াছিলেন বটে— তাঁহার মুখ রাখিবার জন্য নাবিক রণ-পণ্ডিত ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেম্‌স্ উদাহরণ আছেন— কিন্তু সমস্ত সৈন্য না আসিলে যখন রাজপুরী অধিকৃত হয় নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, রাজা পলাইলে. পরেও পুরীরক্ষকেরা যুদ্ধ করিয়া সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীকে বিমুখ করিয়াছিল। সপ্তদশ অশ্বারোহী কিছু করিতে পারে নাই— কেবল তাহারা মার্শমান প্রভৃতি স্থূলবুদ্ধি সাহেবদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বখ্‌তিয়ার সমস্ত সৈন্য লইয়া পুরী ও নগর অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে তাঁহার এক বৎসর লাগিয়াছিল, ইহা মিনূহাজ্‌উদ্দীন নিজেই লিখিয়াছেন। সপ্তদশ অশ্বারোহী পদার্পণ করিয়াই দেশ জয় করা দূরে থাক, সমস্ত মুসলমান সেনা এক বৎসরের কমে রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

তৃতীয়তঃ, এক বৎসরে সমস্ত মুসলমান সেনা লইয়া বখ্‌তিয়ার যাহা জয় করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা নহে— লক্ষ্মণাবতী। বাঙ্গালা যে নয় দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, বখ্‌তিয়ার তাহার মধ্যে একটি মাত্র জয় করিয়াই কেবল ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার জয়কর্তা বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছেন। তিনি নিজে জীবিত কালে বাঙ্গালায় আর কোনো অংশ জয় করিতে পাবেন নাই। কামরূপ জয় করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামরূপরাজেব নিকট হইতে ব্যাঘ্রতাড়িত শৃগালপালের ন্যায় সসৈন্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পাঠানবংশে কেহই সমস্ত বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। মোগলেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কৃতকার্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনো কোনো প্রদেশ তাঁহাদেরও অবিদিত ছিল— যথা কুচবেহার ও বিষ্ণুপুর। কেবল ইংরেজই প্রকৃতার্থে বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন— সপ্তদশ চৌরে. বাঙ্গালা জয় করে নাই।

তারপর আমার বক্তব্য এই যে, আদৌ মিনূহাজ্‌উদ্দীনের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে ইতিহাস লেখে সেই সত্য লেখে না। কেহ ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা লেখে, কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা লেখে। মিনূহাজ্‌উদ্দীনের ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা লিখিবার সম্ভাবনা কি না, তাহা পরে বিবেচনা করিব। আগে দেখি অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা কথা বলিবার সম্ভাবনা আছে কি না। বাঙ্গালা জয়ের বৃত্তান্ত মিনূহাজ্‌উদ্দীন কিসে জানিলেন? যে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু মিনূহাজ্‌উদ্দীন স্বয়ং বাঙ্গালা জয় দেখেন নাই; তিনি সে সময়ের লোক নহেন। তিনি বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে নিজ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। স্বয়ং না দেখুন, ঘটনার সমকালিক লোক না হউন, কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বনপূর্বক লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার কথা মানি। কিন্তু মিনূহাজ্‌উদ্দীন কোনো বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লেখেন নাই। নাই হউক— যদি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও মানি। তাঁহারও সেই দাবি-দাওয়া— বিশ্বাসের উপর তাঁহার অন্য দাবিদাওয়া নাই। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালায় মাস কত বাস করিয়া লোকের সঙ্গে কথোপকথনের দ্বারা বাঙ্গালার জয় বৃত্তান্ত জানিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কবে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন? তাহার ঠিকানা করা যায়। ইং ১২৪৪ সালে, তৈমুর খাঁ ও তোঘন খাঁ নামক দুইজন মুসলমানে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া বিবাদ হয়। ইতিহাসে পড়া যায়, মিনূহাজ্‌উদ্দীন মধ্যস্থ হইয়া রফা করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালা জয়ের ৪০ বৎসর পরে তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এই ৪০ বৎসর পাঠানেরা নিয়ত যুদ্ধে বিব্রত ছিল। কতকগুলি যোদ্ধা, যদি চল্লিশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করে, তবে তাহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিবে এমত সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধেই সবাই মরিবে

এমত বলিতেছি না। ইহা সম্ভব নহে যে, বখ্‌তিয়ার কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু বা কিশোর বয়স্ক কুমার লইয়া অপরিচিত দেশ জয় করিতে আসেন। অতএব তাঁহার সহচর যোদ্ধবর্গ, আর ৪০ বৎসরের মধ্যে সহজেই— কেবল মনুষ্যজীবনের ক্ষুদ্র আয়তন পূর্ণ হইল বলিয়াই— স্বর্গারোহণ করাই সম্ভব। তবে, যদি লড়াই ঝগড়া না থাকিত, তাহা হইলেও সত্তর আশি বৎসরের বুড়া দুই চারিজনকে পাওয়া গেলে যাইতে পারিত। কিন্তু যখন বঙ্গবিজেতাদিগকে প্রতিবৎসর অসিহস্তে যুদ্ধে বাহির হইতে হইয়াছে, তখন চল্লিশ বৎসর পরে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পাওয়া যাইবে, ইহা বড় সম্ভব নয়। ধরা যাউক যে, চল্লিশ বৎসর পরেও কেহ কেহ বাঁচিয়াছিল। যদি কেহ ছিল, তবে তাহাদের কথায় কতদূর বিশ্বাস করা উচিত? যদি কেহ বাঁচিয়া থাকে, তবে দুই একজন বুড়া মাত্র। বাঙ্গালা জয়ের গল্পটা তাহাদের একচেটে মহল— কেহ প্রতিবাদ করিবার নাই। তারপর বুড়া বয়সে কিছু গাল-গল্পের শ্রীবৃদ্ধি— মনুষ্য মাত্রেরই এই স্বভাব। তারপর, গল্পটার বিষয় আপনাদের মরদানি— সেই বহুকাল অন্তর্হিত জোয়ানগির বাহাদুরি। তার উপর বিজিত, ঘৃণিত, শত্রুপদেস্থিত, কাফেরদের জব্দ করার কথা। সেই বুড়ারা যে আপনাদের কেরদানি না বাড়াইয়া, মিন্‌হাজ্‌উদ্দীনকে সত্য কথা বলিয়াছিল, যাহার বিশ্বাস হয় হউক— আমি এমন বিশ্বাস করিব না। আজিকার দিনে আমাদের চক্ষের উপর যে সকল ঘটনা হইতেছে, তাহাতে জাতীয় গৌরবের সম্বন্ধ থাকিলে, তাহারই সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা যায় না। সত্যাভিমানী কৃতবিদ্য, বড় সভ্য, জাতিদিগের মধ্যে যাহা কোটি কোটি চক্ষের উপর হইতেছে, তাহাই সত্যমিথ্যা জানা যায় না। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে কে জিতিল তাহা আজিও জানিতে পারিলাম না। ইংরেজ বলে আমাদের ওয়েলিংটন জিতিয়াছে। জর্মান বলে আমাদের ব্লুচর জিতিয়াছে। ফরাশী

বলে কেহ জেতে নাই; আমাদেরই কুলাঙ্গার বুর্মো ও গ্রুশির বিশ্বাসঘাতকতায় আমরা হারিয়াছি। আইলোর লড়াই নাপোলেয়ন জিতিল কি হারিল তাহা ইতিহাস আজিও ঠিক বলে না। তুলুসের যুদ্ধে ইংরেজ জিতিল, কি ফরাশী জিতিল, তাহা লইয়া ঘোর বিবাদ। বিদেশ দূরে থাক, যে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক অন্ধকারের কথায় আন্দোলন করিতেছি, সেই বাঙ্গালার ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নে আইস। পলাশির যুদ্ধ ইংরেজের আমলে হইয়াছে; ইংরেজ বিজেতারা— যাঁহারা স্বয়ং লড়াই করিয়াছিলেন— তাঁহারা নিজে সে যুদ্ধ সম্বন্ধে, চিঠিপত্র, রিপোর্ট, ডেস্পাচ, করেস্পণ্ডেন্স, মেময়ের, ইতিহাস— এইরূপ বহুতর লিখিয়াছেন। সেই মূলের উপর নিশান গাড়িয়া, ইংরেজি ইতিহাস বলে যে, তিনশত ইংরেজ জনকত তেলাঙ্গার সাহায্যে পঞ্চাশ হাজার নবাবী ফৌজ পরাজয় করিয়াছিল— ইহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর আর এক এডিশ্যন্। সৌভাগ্যক্রমে, এইখানে একজন ইংরেজের পক্ষবাদী মুসলমান ইংরেজের মধ্যাহ্ন সূর্যের কাছে একটি মুস্কিল আসানের চেরাগ জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় স্থূল বৃত্তান্ত এই জানা যায় যে, পলাশিতে যেটুকু যুদ্ধ হইয়াছিল, সেটুকু ইংরেজের হার হইয়াছিল। বেগোছ দেখিয়া ক্লাইব মীরজাফরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ আবার কি? সত্যকার লড়াইয়ের তো কথা ছিল না। শুনিয়া মীরজাফর নবাবকে বলিলেন যে, আজ বেলা গিয়াছে, আজ আর যুদ্ধে কাজ নাই— ফৌজ ফিরিয়া আসুক। নবাবের ফৌজ ফিরিল। তখন ক্লাইব পিছন হইতে তাহাদের উপর গোটাকত কামান দাগিলেন। পলাশির লড়াই ফতে হইল। সেও আজ ১২৫ বৎসরের কথা। পঞ্জাবের লড়াই আজিও চল্লিশ বৎসর হয় নাই— পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেরই সে কথা মনে থাকিতে পারে। ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে মুদকীর লড়াইয়ে, ফিরোজসহরের লড়াইয়ে, চিলিয়ান্-

ওয়ালার লড়াইয়ে ইংরেজের জয় হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজি ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারা জানেন যে সে বৃত্তান্ত কি।

যদি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মধ্যাহ্নে, যদি সত্যনিষ্ঠ কৃতবিদ্য জাতির মধ্যে, যদি কোটি দর্শকের চক্ষুর উপর, যদি এই লেখালেখি, দেখাদেখির মধ্যে, যদি এই সংবাদপত্র, পত্রপ্রেরক, সমালোচক বাজারের মধ্যে, ছাপাখানা, ডাকঘর, স্বজাতি, ভিন্ন জাতির সাক্ষাৎকার এইরূপ ইতিহাস চলে, তবে সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর ঘোরান্ধকারে, বাঙ্গালার ন্যায় ইতিহাসশূন্য স্থানে, অশীতিপর গালগল্পপরায়ণ, আত্মগরিমায় অন্ধ, বাঙ্গালীর দ্বেষক জন দুই বুড়া মুসলমানের কথায় বিশ্বাস কি ?

মনে করো, যেন তাহারা সত্য কথাই মিন্‌হাজ্‌উদ্দিনকে বলিয়াছিল, তাহা হইলেও মিন্‌হাজ্‌উদ্দিন যে সত্য কথা লিখিয়াছেন তাহার ঠিক কি ? পূর্বেই বলিয়াছি কোনো জাতিই মিথ্যা কথা দ্বারা স্বজাতির গৌরব বাড়াইতে ত্রুটি করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা এই সব সময়ে কখনই সত্য লেখেন না। যেখানে হিন্দুদিগের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা হয় হিন্দুদিগের কীর্তি একেবারে গোপন করিয়াছেন, নয় যেখানে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, সেখানে মিথ্যা রচনা করিয়া জাতীয় গৌরব বাড়াইয়াছেন। হিন্দুদিগের কীর্তি যে তাঁহারা সচরাচর গোপন করেন, তাহার তিনটি উদাহরণ দিব।

প্রথম উদাহরণ, রাজপুতানা। রাজপুতানা, মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট। তাহার চারিপাশে মুসলমান রাজ্য। মুসলমানেরা ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিল, কিন্তু মাঝখানে এই রাজপুতমণ্ডল মুসলমান রাজ্যের বহির্ভূত রহিল। রাজপুতানা অধিকার করিতে মুসলমানেরা যত্নের ত্রুটি কিছুই করে নাই। পাঠানরাজার শ্রেষ্ঠ আলাউদ্দিন, মোগল বাদশাহার শ্রেষ্ঠ আকবর ;

আরও যে পারিয়াছে সেই পুনঃ পুনঃ রাজপুতানা আক্রমণ করিয়াছে। অনেকবার মুসলমানের রণজয় হইয়াছে; যতবার রণজয় হইয়াছে, ততবার ক্ষুদ্র রাজপুত রাজগণ আবার স্বাধীন হইয়াছে, আবার মুসলমানকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ইহা সামান্য বীরত্বের পরিচয় নহে। সসাগরা ভারতেশ্বরগণ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত না হইলে, কখনো এ ফল ফলে নাই— মুসলমান শক্তি থাকিতে কখনো কোনো দেশ ছাড়ে নাই। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা রাজপুতানায় মুসলমানের জয়েরই পরিচয় দিয়াছেন —মুসলমানের পরাজয়ের একছত্রও কেহ কোথাও লেখেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে, রাজপুতানার ইতিহাস রাজপুতে লিখিয়া রাখিয়াছিল। রাজপুতের ঘর হইতে সেই ইতিহাস বাহির করিয়া একজন ইংরেজ তাহা প্রচার করিয়াছেন। কর্ণেল টডের গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, মুসলমান সম্রাট ক্ষুদ্র রাজপুত কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছেন। সেই কথা বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না তাহা সত্য না হইলে শেষ পর্যন্ত রাজপুতানা স্বাধীন থাকিত না। অথচ রাজপুতদিগের এই অলৌকিক কীর্তির বিন্দুবিসর্গ মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা প্রচার করেন নাই। যে যুদ্ধ রাজপুতানার মারাথন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহা রাজপুতানার থার্মপিলি, মুসলমানেরা তাহার কথা মুখে আনেন না।

দ্বিতীয় উদাহরণ, দাক্ষিণাত্যে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমানেরা দিল্লীতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন— ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই চারিশত বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা মুসলমানদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল। সেই হিন্দুদিগের কয়টা কথা মুসলমানেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন? সেই হিন্দুদিগের মুখোজ্জ্বলকারী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কথা, একজন ইংরেজ লেখক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The commencement of the sixteenth century discloses the allies fighting rather unsuccessfully against the great Hindu monarch of the south, who at that time founded a power which threatened to sweep the Mahomedans into the sea. The heroism and policy of Krishna Raya still live in the songs of Southern India. The popular legends love to relate how he carried his victorious arms from Ceylon to the mountains of Thibet, and sober history recognises in him the last breakwater which Hindu valor opposed to Mussulman conquest. In this great national struggle the Orissa monarch fought on the unpatriotic side. But his perfidy failed to yield safety. The southern monarch crushed the unholy alliance, and the Orissa king found himself compelled to give up his daughter in marriage to the last of the Hindu heroes. * * * We may pass over with a smile the legendary expeditions of their hero-monarch from Ceylon to Thibet ; but the Portuguese historians attest his greatness, and all India, from the Narbudda downwards, acknowledge his sway."*

হণ্টর সাহেব একটি নোটে পর্তুগিস ইতিহাসবেত্তাদের কথা লিখিয়াছেন, "They mention Krishna Raya's siege of

* **Hunter's Orissa, Vol II, pp. 7-9.**

Rachol, near Bombay, with an army of 35,000 horse and 733,000 foot. A Mahommedan force which advanced to relieve the city was defeated, and had to accept, as the degrading terms of peace, the acknowledgement of Krishna Raya as the Lord Paramount of Kanara, and the kissing of his feet." pp. 8-9.

পাঠান বা মোগল, মহারাষ্ট্র বা ইংরেজ, ভারতবর্ষে কেহ কখনো আট লক্ষ সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা, ভারতবর্ষের মুসলমানি ইতিহাসে এই মুসলমানের যমদণ্ড স্বরূপ মহাবীরপুরুষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে? আমি ফারসি জানি না, কিন্তু যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাঁহারা কৃষ্ণরায়ের নামও করেন নাই। এ সকল নাম করিয়া তাঁহারা লেখনীকে পাপগ্রস্ত করেন না। সের শাহা বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস লেখকজীরা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না—রাজা গণেশ বাঙ্গালা জয় করিলেন, তাহার ইতিহাস মোটে তিন ছত্র লিখিলেন।

তৃতীয় উদাহরণ—উড়িষ্যা। পরের রাজ্য বিশেষ হিন্দুরাজ্য দেখিলে তাহা কাড়িয়া লইতে হইবে, ইহা মুসলমানদিগের অলঙ্ঘ্য ব্রত ছিল। পাঠানেরা বাঙ্গালায় সিংহাসন স্থাপন করিয়া, সীমান্তস্থিত উড়িষ্যা রাজ্যের প্রতি যে লোভ করেন নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালায় স্থির হইয়াই, পুনঃ পুনঃ উড়িষ্যা জয়ের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাড়ে তিনশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। যে উড়িয়ারা, এখন একজন বাঙ্গালীর ধমকে কাঁদিয়া ফেলে, সে উড়িয়ারা তখন প্রকৃত বীরপুরুষ ছিল। বাঙ্গালা জয়ের পর প্রথম অর্ধ শতাব্দী মধ্যে বাঙ্গালার পাঠানেরা চারিবার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; চারিবারই উড়িয়া খণ্ডাইতদিগের অস্ত্রাঘাতের জ্বালায় প্রাণ

লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা এই সকল যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই এমত নহে। কিন্তু তাঁহারা যাহা লেখেন তাহাতে এই বুঝিতে হয় যে, মুসলমান সেনাপতিরা উড়িষ্যা জয় করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জয় করিয়া পলায়ন করা একপ্রকার নূতন রকমের যুদ্ধ বটে; ইহা কেবল মুসলমান লেখক-দিগের কাছেই শুনিতে পাই। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে মুসলমানকৃত ভারত জয়ের বৃত্তান্ত সমালোচনা করিয়া, এই পলায়নতৎপর বিজেতৃবর্গের কীর্তিকলাপের পরিচয় দিব। বসরার খলিফাগণের সেনাপতি সম্প্রদায় হইতে ঘোরীর সাহাবুদ্দীন পর্যন্ত মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ধরিয়া কেবল ভারতবর্ষ জয় করিয়া পলাইতেন। শেষ যেবার শিকায় ছিঁড়িল, সেবার আর পলাইলেন না!

সে যাই হউক, উড়িয়াদিগের সঙ্গে পাঠানদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধ একটি কৌতুকাবহ পরিচয় দিয়া, এ বিষয়ে এখন ক্ষান্ত হইব। ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তোঘন খাঁ নামে একজন উগ্রস্বভাব তাতার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তোঘন সসৈন্যে উড়িষ্যাজয়ে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহ দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। লোকে তাঁহাকে লাঙ্গুলীয় নরসিংহ বলিত; কেন, তাহা জানি না। কিন্তু এই লাঙ্গুলীয়ের নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। তিনিই কোনার্কের অদ্ভুত সূর্যমন্দির প্রস্তুত করেন— জগতে অতুল্য কীর্তি। তিনি শাহাজাঁহার মত নির্মাত ছিলেন; তাঁহার অপেক্ষা রণপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হস্তে তাতারের বর্বর এরূপ প্রহার প্রাপ্ত হইলেন যে, সসৈন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে গৌড়াভিমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু লাঙ্গুলীয় ছাড়িবার পাত্র নহে— সৈন্য লইয়া খাঁ সাহেবের পিছু পিছু ছুটিল। উড়িয়া সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বীরভূমের রাজধানী নগরে মুসলমানদের এক আড্ডা ছিল— একভাগ গিয়া বীরভূম জয় করিয়া নগর অধিকৃত করিল। আর একভাগ

গৌড়ে গিয়া রাজধানী অধিকৃত করিল। তোঘন ফাঁপরে পড়িয়া দিল্লীর বাদশাহের কাছে নালিস করিলেন। দিল্লীশ্বর গৌড় পুনর্জয়ের জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। শুনিয়া নরসিংহ দেব হাতির উপর লুঠের মাল বোঝাই করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখক ফেরেশতা এই ঘটনা লইয়া বড় গোলে পড়িলেন। হিন্দুর হাতে মুসলমানের এ অপমান কি প্রকারে লেখেন? বুদ্ধি খরচ করিয়া লিখিলেন, জঙ্গীস্ খাঁ তাঁহার অসংখ্য সেনা প্রবাহ লইয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার কৃপায়, যাজপুরের লাঙ্গুলীয় পৃথিবী প্রমথনকারী জঙ্গীস্ খাঁ হইয়া গেল— উড়িষ্যার খণ্ডাইতেরা মোগলসেনা হইয়া গেল। আর বাকি কি?

এই ত মুসলমানি ইতিহাস। মীনূহাজ্উদ্দীনও সেই গোষ্ঠী। তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যাসত্য নির্বাচন করা যাইতে পারে না। বখ্তিয়ারের কামরূপের যুদ্ধের বিবরণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মিনূহাজ্উদ্দিন উপন্যাস লেখক— ইতিহাস লেখক নহেন। ইহা হইতে পারে, তাঁহার লিখিত বাঙ্গালা জয়ের বিবরণ সত্য— হইতে পারে মিথ্যা। কোনো দিক ঠিক করিয়া বলা যায় না। ইহা নিশ্চিত যে লক্ষ্মণাবতী বিজিত হইয়াছিল। আর সে সময়ে লক্ষ্মণাবতীর যে অবস্থা, তাহার পর্যালোচনায় ইহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, লক্ষ্মণাবতী সহজে বিজিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সে সময়ে সামাজিক ঐক্য ছিল না। শাসনকর্তৃগণ আর্য— প্রজাগণ অনার্য। সাধারণ প্রজার পক্ষে মুসলমান যেমন পর, আর্যেরাও তেমনি পর। এ অবস্থায় আর্যের জন্য যে অনার্যেরা মুসলমানের বিরোধী হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। বরং সাম্যময় ইস্লাম, বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্মের অপেক্ষা তাহাদের কাছে আদরণীয়— নীচ জাতি বলিয়া আর্যের কাছে তাহারা ঘৃণিত— মুসলমান নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এই জন্যই

মুসলমান জয়ের পর অর্দ্ধেক অনার্য হিন্দু ইস্‌লামের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয়, লক্ষ্মণাবতী তখন এক বৃদ্ধ, অকর্মণ্য রাজার হাতে পড়িয়াছিল। রাজা রাজ্যরক্ষণে অক্ষম; আর কে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবে? ভারতবর্ষীয় প্রজার পক্ষে রাজ্য রাজার, তিনি রক্ষা করিতে হয় করিবেন, না হয় পরে লইবে, প্রজার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। এ কথা ভারতকলঙ্কে একবার বুঝাইয়াছি। বাঙ্গালার অন্যান্য রাজ্য মুসলমানেরা শীঘ্র অধিকার করিতে পারেন নাই— সে সকল রাজ্যে সেন রাজার মত অকর্মণ্য বৃদ্ধ পায়েন নাই। তৃতীয়, লক্ষ্মণাবতীতে— বাঙ্গালার অধিকাংশ রাজ্যে, তখন যুদ্ধব্যবসায়ী কোনো সম্প্রদায় ছিল না। পড়া যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় বাঙ্গালায় আসে নাই। আর্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশে, প্রকৃত ক্ষত্রিয় না থাকুক, রাজপুত ছিল। সেই জন্য পশ্চিম ভারত অধিকার করিতে মুসলমানদিগকে সাত শত বৎসর কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। লক্ষ্মণাবতীতে তাহা ছিল না— লক্ষ্মণাবতী এক বৎসরে অধিকৃত হইল।

বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে লক্ষ্মণাবতীর সেই অবস্থা তুলনা করিয়া দেখা যাউক। দেখিতেছি বাঙ্গালার এই অবস্থা আজিও আছে। তখন যেমন আর্যে অনার্যে অনৈক্য ছিল এখনও সেইরূপ হিন্দু মুসলমানে অনৈক্য আছে। তখন যেমন যুদ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল না— এখনও নাই। রাজা এখন খুব যুদ্ধতৎপর বটে, কিন্তু ইংরেজ গেলে কি হইবে? যে পারিবে সেই আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবে। বাঙ্গালীর উচিত ইংরেজের সৈন্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করা।

১২৮৯ আশ্বিন